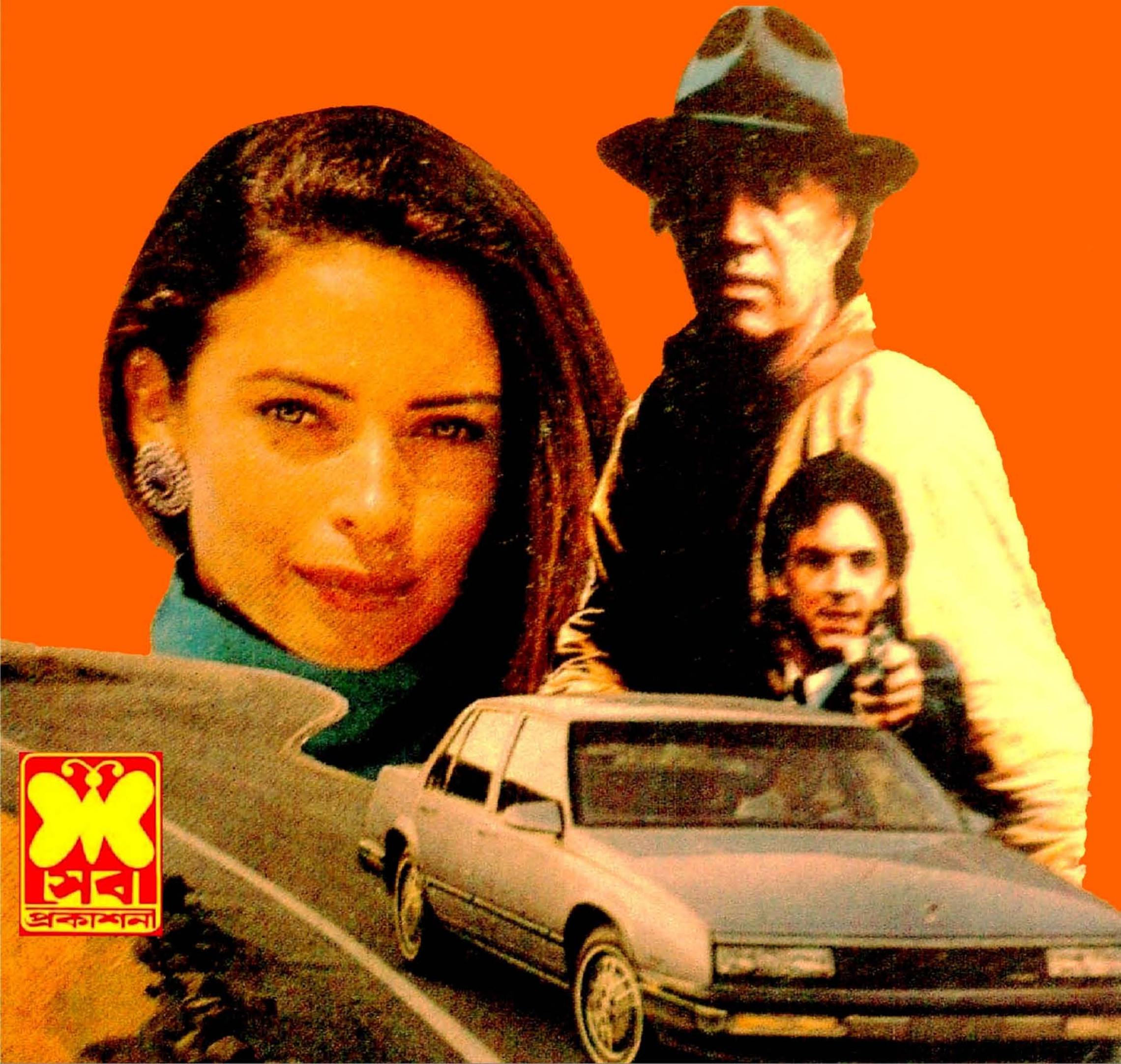
মাসুদ রানা

# কালপুরুষ

১ম খন্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন



মাসুদ রানা

# কালপুরুষ

## প্রথম খণ্ড

## কাজী আনোয়ার হোসেন

হঠাৎ করে আগুন লাগল রানা এজেন্সির নিউ ইয়র্ক অফিসে। লাগল মানে, লাগানো হলো।
কে করল কাজটা? আর্থার স্যাণ্ডলার? কেন?
আসলে কি ছিল চুরি যাওয়া দলিলে?
অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে পিছন দিক দিয়ে ফ্ল্যাট ত্যাগ করল মাসুদ রানা, একই সময়ে ফ্ল্যাটের সামনে খুন হয়ে গেল আরেক যুবক। আকারে-গঠনে অবিকল মাসুদ রানার মত সে।

ভুল করেছে হত্যাকারী? নিজেকে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম বলে দাবি করছে মেয়েটি, অথচ, আসল লেসলির কবর দেখে এসেছে রানা আর্ল'স কোর্টের এক কবরস্থানে। তাহলে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

# কাল পুরুষ-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

## এক

'দারুণ কোন আরসনিস্টের কাজ এটা,' মধ্যমা দিয়ে নাকের পাশ চুলকাতে চুলকাতে বলল চিন্তিত করিগান, নিউ ইয়র্ক সিটি ফায়ার ডিপার্টমেন্টের এক তরুণ লেফটেন্যান্ট। 'এমনভাবে ঘটানো হয়েছে অগ্নিকাণ্ড, বোঝা খুব মুশকিল যে কারও কারসাজি আছে এর পিছনে। আপনাদের নাইটগার্ড যদি সময় থাকতে আমাদের টেলিফোন না করত, এতক্ষণে হয়তো পুরো বিল্ডিঙে ছড়িয়ে পড়ত আগুন। এবং সে-ক্ষেত্রে আগুন লাগানোর ব্যাপারে যে ওস্তাদীর আশ্রয় নেয়া হয়েছে, তা ধরার কোন পথ থাকত না।'

মুখ তুলে কোণের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো দামী কাঠের আধপোড়া ফাইলিং কেবিনেটটা ইঙ্গিত করল করিগান। 'অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে ওটা।'

দুই কোমরে হাত রেখে নিজের অফিস রুমে দাঁড়িয়ে আছে কাঁচা ঘুম থেকে উঠে আসা মাসুদ রানা। হতভম্ব। এবং চিন্তিত বিহ্বল দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। এইমাত্র পৌঁছেছে ও 'রানা এজেন্সি'র অফিস বিল্ডিঙে আগুন লাগার খবর পেয়ে। বিশেষ কাজে এক সপ্তাহ আগে নিউ ইয়র্ক এসেছে রানা। কয়েক ঘণ্টা আগেও এই রুমে বসে কাজ করেছে অনেক রাত পর্যন্ত, তারপর ফিরে গেছে নিজের ঈস্ট সেভেন্টি থার্ড স্ট্রীটের অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে। আর তারপর···

ঘড়ি দেখল মাসুদ রানা। ভোর চারটে প্রায়। মাত্র পাঁচ ঘণ্টার ব্যবধান। এরই মধ্যে ঘটে গেছে এত কিছু। ওর নিজের অফিসরুমসহ স্থানীয় এজেন্সি প্রধান ও কয়েকজন কী-অপারেটরের অফিসরুমের বারোটা বেজে গেছে। কার্পেট, টেবিল-চেয়ার, ফাইল কেবিনেট, সব জায়গায় জায়গায় পুড়ে বিচ্ছিরি অবস্থা। ঘরের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে হালকা ধূসর রঙের পাতলা ধোঁয়ার স্তর। ছাই আর পানির মিলিত গন্ধ রয়েছে ওতে। মিষ্টি মিষ্টি একটা গন্ধ।

'আগুন কি ভাবে ধরানো হয়েছে বলে মনে করেন আপনি?' লেফটেন্যান্টের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'ধরানো হয়েছে' ব্যাপারটা এখনও মেনে নিতে পারছে না ও। কেন কেউ করবে এ কাজ? কী উদ্দেশ্যে?

কাঁধ ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। 'ফিউজের সাহায্যে। একজন ভাল আরসনিস্ট এ কাজে অবশ্যই ফিউজের সাহায্য নেবে। এতে সরে পড়ার জন্যে সময় পাওয়া যায় যথেষ্ট।'

'বৈদ্যুতিক ফিউজ?' প্রশ্ন করল নাইটগার্ড জ্যাকবাস। লোকটা দীর্ঘদেহী, মাঝারি মোটা। বয়স ষাটের মত। কিছু বেশিও হতে পারে

'না। টাইমিং ফিউজ। মোমবাতি, তার, ঘড়ি অথবা এমনকি সিগারেটও হতে পারে।' আবার শ্রাগ করল করিগান। 'যা পুড়ে শেষ হতে সময় লাগে, এবং সেই সুযোগে সরে পড়তে পারে আরসনিস্ট। ভাগ্য ভাল যে সময়মত আমরা এসে পড়ায় ঠিক কোত্থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটেছে সেটা চিহ্নিত করা গেছে। আসুন

আমার সঙ্গে। দেখাচ্ছি।'

লোকটাকে অনুসরণ করে পাশের রুমের পরের রুমে এল মাসুদ রানা। এজেন্সি প্রধানসহ আরও কয়েকজন পৌঁছে গেছে এর মধ্যে, তারাও এল। একই রকম মানসিক অবস্থা সবার। হতভম্ব, চিন্তিত সবাই। জ্যাকবাস এল সবার পিছনে। মেঝেতে একটা জায়গা দেখাল করিগান।

'দেখেছেন? ট্র্যাকস। এই ট্র্যাক ধরে এগিয়েছে আগুন!'

ঝুঁকে পড়ে দেখল রানা। এখানে-ওখানে খাবলা খাবলা পোড়া কার্পেটের মাঝখানে ফিতের মত সরু পোড়া দাগ দেখা যাচ্ছে। কার্পেটের পুরো দৈর্ঘ্য পেরিয়ে পাশের ঘরের কার্পেটে গিয়ে ঠেকেছে দাগটা, সেখান থেকে মাসুদ রানার রুমের দিকে গেছে।

'ট্রেইলারটা যা দিয়েই তৈরি হয়ে থাকুক, সম্ভবত কেমিক্যালি ট্রিটেড ছিল,' ব্যাখ্যা করল লেফটেন্যান্ট। 'ফালি করে কাটা কম্বল হতে পারে, কাগজ হতে পারে অথবা প্লাস্টিকও হতে পারে। ফিউজের গোড়ার সঙ্গে সংযুক্ত ছিল জিনিসটা, ওটা পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ামাত্র স্পার্ক করেছে ট্রেইলার, অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ছুটে গেছে আগুন ট্র্যাক ধরে, বিভিন্ন ডিরেকশনে।'

আবার চিন্তায় ডুবে গেল মাসুদ রানা। কে করল কাজটা? কেন করল? একটা অফিসের ফাইলপত্র, টেবিল-চেয়ার, কার্পেট পুড়িয়ে কার কি লাভ? কোন বিশেষ রেকর্ড ধ্বংস করা? কারও ব্যক্তিগত ফাইল, বা এমনি আর কিছু? কিন্তু সে জন্যে পুরো অফিস বিল্ডিং কেন পোড়াতে হবে? অথচ করিগানের বক্তব্যে এবং ট্র্যাক স্বচক্ষে দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, তাই ঘটাতে চেয়েছিল কেউ। এসব কাজে রানা নিজেও একজন এক্সপার্ট। বলতে গেলে জীবনটাই কেটেছে ওর এইসব ফিউজ-ডিভাইস ইত্যাদি নিয়ে। আর আজ কিনা ও নিজেই···লোকটার প্রশ্ন শুনে সচকিত হলো মাসুদ রানা।

'দামী কিছু ছিল আপনার অফিসে, স্যার? কোন আর্ট, জুয়েলস?'

'না।'

'তাহলে কেন এ কাজ করবে কেউ?' মাথা চুলকাতে লাগল লেফটেন্যান্ট। 'কিসের আশায়?'

জ্যাকবাসের দিকে ফিরল মাসুদ রানা। 'আপনি কোথায় ছিলেন আগুন লাগার সময়? এত তাড়াতাড়ি টের পেলেন কি করে?'

'বাউণ্ডারির ভেতর রাউণ্ডে ছিলাম, স্যার। ধোঁয়ার গন্ধ পেয়ে জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি অল্প অল্প আগুন। সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার ডিপার্টমেন্টে ফোন করি আমি তারপর আপনাকে।'

'খুব দ্রুত কাজ করেছেন আপনি,' প্রশংসার চোখে দীর্ঘদেহী জ্যাকবাসকে দেখল করিগান। 'চমৎকার দায়িত্ব সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। নইলে বোঝাই যেত না যে ব্যাপারটা ষড়যন্ত্রমূলক।'

মাথা দুলিয়ে সায় দিল মাসুদ রানা। চিন্তিত, অন্যমনস্ক। 'হ্যাঁ, সত্যি।'

ম্যানহাটন। ঈস্ট সেভেন্টি থার্ড স্ট্রীট। ভোর চারটা প্রায়। টিপ টিপ বৃষ্টির মধ্যে

ছাপহীন একটা পুলিস কার ধীরগতিতে এসে থামল দু'শো ছেচল্লিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে। ছাদে লাল আলো ফ্ল্যাশ করছে ওটার, তবে সাইরেন বন্ধ। ভেজা সাইডওয়াক ও আশপাশের ভবনগুলোর কাঁচের জানালায় প্রতিফলিত হচ্ছে আলোটা।

অ্যাপার্টমেন্টের প্রবেশ পথের সামনে পুলিসের কম্বল ঢাকা একটা নিথর দেহ পড়ে আছে। ওটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে এক ইউনিফর্ম পরা পেট্রলম্যান, এবং এক সাদা পোশাকের ডিটেকটিভ। গাড়ি থেকে নামল দুই হোমিসাইড ডিটেকটিভ, অ্যারাম সাশাদ ও প্যাটি হেরেন। প্রথম দু'জনকে দেখল তারা ধীরপায়ে এসে দাঁড়াল মৃতদেহটার পাশে।

'দেখে মনে হয় বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিল লোকটা,' মৃদু কণ্ঠে সাশাদকে লক্ষ করে বলল ডিটেকটিভ রেনফ্রো।

দার্শনিকের মত মাথা দোলাল সাশাদ। 'কাঠের পুতুল না হলে প্রত্যেকেই তাই করে থাকে অপঘাতের পাখায় ভর দিয়ে মৃত্যু এসে গেছে টের পেলে।' কম্বলের তলা দিয়ে বেরিয়ে ছয় ফুট দূরের পেভমেন্টে পৌঁছা রক্তের ধারা দেখল সে খানিক বৃষ্টিতে ধুয়ে যাচ্ছে রক্ত। গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে রাস্তায়।

'মুখটা দেখতে চান?' জিজ্ঞেস করল রেনফ্রো।

'কেন নয়?' বলে হাঁটুতে বাঁ হাতের ভর রেখে ঝুঁকল সাশাদ। কম্বলের কোনা ধরে আস্তে করে টান দিল। পানি পেয়ে ফুলে ভারি হয়ে গেছে জিনিসটা ওপর থেকে দেখে আগেই অনুমান করে নিয়েছে সে, প্রায় ছ'ফুট দীর্ঘ ছিল লোকটা। যুবক। চকের মত সাদা হয়ে আছে মুখমণ্ডল চোখ পুরো মেলে চেয়ে আছে। চাউনিতে তীব্র আতঙ্ক। এসব দেখে অভ্যস্ত অ্যারাম সাশাদ। তবু মুখ গলে বেরিয়ে আসা 'জেসাস!' শব্দটা ঠেকাতে ব্যর্থ হলো শেষ পর্যন্ত

যুবকের ডান দিকের গলার মাঝখানে, চোয়ালের হাড়ের সামান্য নিচে বিরাট একটা গর্ত সম্ভবত কসাইয়ের ছুরির কীর্তি। ওখানকার অনেকটা জায়গা একেবারে নেই হয়ে গেছে যুবকের। তার কোট, শার্টের এখানে-ওখানে লেগে আছে ছোপ-ছোপ রক্ত। আরেকবার, অজান্তেই সাশাদের গলা দিয়ে ঠেলে উঠল 'জেসাস!' কম্বল ছেড়ে সোজা হলো সে।

'পরিচয় পাওয়া যায়নি মৃতের,' বলল রেনফ্রো 'শুধু কিছু খুচরো পয়সা, একটা আংটি আর চাবির রিং পাওয়া গেছে।'

'ওয়ালেট?' জানতে চাইল প্যাটি হেরেন।

'পাইনি।'

ব্লকের শেষ মাথার দিকে ঘুরে তাকাল সবাই। বাঁক ঘুরে একটা অ্যাম্বুলেন্স আসছে এদিকে তার হেডলাইটের জোরাল আলো এসে পড়েছে ওদের ওপর মাথায় ঘূর্ণায়মান ওটার লাল টপ লাইট ফ্ল্যাশ করছে নিঃশব্দে। নগরবাসীর শেষ রাতের ঘুমে বিঘ্ন ঘটাতে চায় না সাইরেন বাজিয়ে।

'হত্যাকাণ্ডের একজন প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া গেছে।'

তেতো খাওয়া চেহারা করে রেনফ্রোর দিকে ফিরল অ্যারাম সাশাদ। 'যন্ত্রণা!'

ওদের গজ দশেক তফাতে থেমে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে অ্যাম্বুলেন্সটা। হাত

তুলে ওদের ঠিক সোজা, রাস্তার ওপারে সাইডওয়াকে অপেক্ষমাণ এক ছোটখাট মহিলাকে দেখাল রেনফ্রো। 'পুরো ঘটনা চাক্ষুষ করেছে মহিলা।'

'হেল!' বলে ঘুরে দাঁড়াল সাশাদ, ওপার যাবে। মনে মনে বিরক্ত। ভেবেছিল 'ন্যাচারাল কজ' বলে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত চালাবার ঝুট ঝামেলা থেকে বাঁচার চেষ্টা করবে। কিন্তু হলো না সাক্ষী থাকলে হবেই বা কি করে? ঘাড় ফিরিয়ে সঙ্গীর উদ্দেশে বলল, 'তুমি আসবে?'

'তুমি এগোও। আমি আসছি।'

মাপা, দীর্ঘ পায়ে রাস্তা পেরিয়ে এল অ্যারাম সাশাদ। সাইডওয়াকে উঠে মহিলার সামনে এসে দাঁড়াল, সংক্ষেপে জানাল নিজের পরিচয়। 'আমার বাসায় আসুন, অফিসার,' কাঁপা, ভীত কণ্ঠে বলল মহিলা।

ওদের সঙ্গে যোগ দিল এসে হেরেন। সাইডওয়াকের সঙ্গেই দুই রুমের এক অ্যাপার্টমেন্টে থাকে মহিলা, মিনি ইয়াঙ্কোভিচ। বিধবা। পঁচাত্তরের মত বয়স। দাঁত নেই একটিও। সারা মুখে গিজ গিজ করছে বলিরেখা। তার মিনি লিভিংরুমে বসল ওরা। সাশাদের হাতে নোটবই, পেন্সিল। ঘটনাটা প্রথম থেকে নিজের মত করে বলে গেল মহিলা। মন দিয়ে শুনল দুই ডিটেকটিভ।

রাতে ঘুম একেবারেই হয় না মিনি ইয়াঙ্কোভিচের। প্রায় আট-দশ বছর ধরে চলছে এরকম, অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে এখন ব্যাপারটা একলা একজনের সংসার। পোষা বেড়াল আছে একটা, ওটার সঙ্গে কথা বলে আর রাস্তা দেখে রাত কাটায় সে। আজও তাই করছিল মিনি ইয়াঙ্কোভিচ, তার কোলে ঘুমে ঢুলছে বেড়ালটা। এই সময়, ভোর সোয়া তিনটার দিকে, রেইনকোট পরা ভদ্রবেশী দুই লোকের ওপর চোখ পড়ে তার। একজন দাঁড়িয়ে ছিল দু'শো ছেচল্লিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের প্রবেশ পথের পাশে ছায়ামত একটা জায়গায়।

আরেকজন ছিল সাইডওয়াকে, হাঁটাহাঁটির ওপর। দু'বার তাকে থার্ড অ্যাভিনিউর দিকে যেতে দেখেছে মহিলা। অ্যাভিনিউর শেষ মাথায় একটা ফোন বুদ আছে, ওর মধ্যে ঢুকেছে সে দু'বারই। দ্বিতীয়বার ওখান থেকে ফিরে সঙ্গীর পাশে অবস্থান নেয় সে। ওর পর আর নড়েনি সে জায়গা ছেড়ে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল ওরা দু'জন অনেকক্ষণ। ভাব-সাব দেখে পরিষ্কার বোঝা গেছে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা।

তারপর?

তারপর দু'শো ছেচল্লিশের দরজা খুলে বেরিয়ে এল এক যুবক। চোখের পলকে তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ল লোক দুটো। একজনের হাতে: হাঁটাহাঁটি করছিল যে লোক, ইয়া বড় এক ছোরা ছিল। রাস্তার আলোয় পলকের জন্যে ঝিকিয়ে ওঠে ছোরাটা, পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে যায় যুবক। মরিয়া হয়ে আবার বাড়ির ভেতর ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল হতভাগ্য যুবক, কিন্তু পারেনি ততক্ষণে তার গলায় ছোরা ঢুকিয়ে দিয়েছে সেই লোক। প্রকাণ্ড ছোরা, কসাইরা যা দিয়ে মাংস কাটে, তেমনি। না, আক্রমণ-কারীদের চেহারা দেখতে পায়নি মিনি ইয়াঙ্কোভিচ চোখে কম দেখে সে।

'আক্রান্ত যুবক চিৎকার করেনি?' জানতে চাইল হেরেন।

মাথা দোলাল বৃদ্ধা। 'সময়ই পায়নি। কিছু বুঝে ওঠার আগেই শেষ হয়ে গেছে বেচারা। তারপর তার পকেট থেকে ওয়ালেট বের করে নেয় অন্যজন। আমার মনে হয় না ওটার জন্যেই লোকটা খুন হয়েছে, অফিসার। নিশ্চই এর মধ্যে আর কিছু আছে। শুধু মানিব্যাগের লোভে এভাবে কাউকে খুন করা,' সরু কাঁধ দুটো মুহূর্তের জন্যে ওপরে তুলেই ছেড়ে দিল মিনি ইয়াঙ্কোভিচ, 'অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার।'

'অবিশ্বাস্য কেন ভাবছেন?' নোটবুক থেকে মুখ তুলল অ্যারাম সাশাদ।

নার্ভাস হাসি ফুটল বৃদ্ধার ফোকলা, ফ্যাকাসে মুখে। 'খুনী দুটোর পোশাক-আশাক দামী বলেই মনে হয়েছে আমার। রেইনকোটও তাই। যথেষ্ট দামী।'

'নিগ্রো?'

'না, সাদা ওটাও আমার সন্দেহের আরেকটা কারণ। সাদা ছিনতাইকারী...' আবার কাঁধ ঝাঁকাল বৃদ্ধা। থেমে গেল বক্তব্য শেষ না করে।

মিনি ইয়াঙ্কোভিচকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে এল দুই গোয়েন্দা অফিসার। রাস্তা পার হয়ে মৃতদেহটার কাছে এসে দাঁড়াল। সাদা পোশাক পরা দুই মেল নার্স অ্যাম্বুলেন্স থেকে বেরিয়ে এল ওদের দেখে মাথা দুলিয়ে লাশ তুলে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিল তাদের অ্যারাম সাশাদ।

'কি বলল মহিলা?' জানতে চাইল রেনফ্রো। 'কাজের কিছু?'

মাথা দোলাল সাশাদ। আনমনে অ্যাম্বুলেন্সের বিলীয়মান টেইল লাইটের দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'বুঝতে পারছি না।'

'অর্থাৎ সাধারণ ক্যাশ-অ্যাণ্ড-ক্যারি স্ট্রীট জব না এটা?'

খুনীরা যেখানটায় ওঁৎ পেতে দাঁড়িয়ে ছিল সেদিকে তাকিয়ে নিচের ঠোঁট চুষতে লাগল সাশাদ। ওখানে পায়ের ছাপ খুঁজে লাভ নেই, ভাবছে সে। ওটা পাকা জায়গা, এবং বৃষ্টি পড়ছে। কাজেই... সচকিত হলো অ্যারাম সাশাদ। তাকাল রেনফ্রোর দিকে। 'সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে আরও একটু ভেবে দেখতে হবে। এখনই কোন মন্তব্য করতে চাই না।'

ছ'টার দিকে দুই সিটি ফায়ার ডিটেকটিভের ওপর রানা এজেন্সির অগ্নিকাণ্ডের তদন্ত-ভার ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছে লেফটেন্যান্ট করিগ্যান মাসুদ রানা, এজেন্সির স্থানীয় প্রধান এবং কয়েকজন বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে এ মুহূর্তে অফিসে। জ্যাকবাস ছাড়া আমেরিকান স্টাফদের কেউ নেই। বড়দিন আর নববর্ষের ছুটি চলছে এখন। তারা সবাই ছুটিতে। এজেন্সির স্বাভাবিক কাজকর্ম প্রায় বন্ধ আছে গত কয়েক দিন থেকে আরও প্রায় এক সপ্তাহ চলবে এ অবস্থা।

বড়দিনের ছুটি জ্যাকবাসের প্রয়োজন হয় না, কারণ সে ইহুদী। চাইলে নববর্ষের ছুটি অবশ্য পেত, কিন্তু পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা সে। আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। যাওয়ার কোন জায়গা নেই তাই ছুটি নেয়নি জ্যাকবাস ছয় বছর ধরে রানা এজেন্সির নাইটগার্ডের চাকরি করছে লোকটা, এর মধ্যে একদিনের জন্যেও ছুটি নেয়নি কখনও। অত্যন্ত বিশ্বস্ত, কাজপাগল মানুষ জ্যাকবাস।

সাড়ে পাঁচে তদন্ত কাজ শেষ করল ডিটেকটিভদের একজন, ফ্র্যাঙ্ক

বিয়ানকো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছল। 'প্যারাফিন ক্যান্ডেল,' মাসুদ রানার দিকে তাকিয়ে ঘোষণা করল সে 'এবং সেলুলয়েড। টেকনিকটা বেশ পুরানো, তবে বিশ্বস্ত।'

বিভিন্ন রুমের ভেজা কার্পেটের সাতটা জায়গা চিহ্নিত করেছে সে এর মধ্যে। পানিতে ভিজে এমনিতেই গাঢ় রং পেয়েছে ওগুলো, তার মধ্যে এই সাতটা জায়গা আরও বেশি গাঢ় প্যারাফিনের মোমবাতি গলে মিশে গেছে কার্পেটের গায়ে। খোঁচা দিলে উঠে আসে 'সাতটা স্ট্র্যাটেজিক্যাল স্থানে বসানো হয়েছে এগুলো যাতে বাতাসের অনুকূল ক্রসকারেন্ট একেবারে শেষ পর্যন্ত জ্বলতে সাহায্য করে বাতিগুলোকে, অনায়াসে আগুনের স্পর্শ পায় সেলুলয়েডের ট্রেইলার। প্যারাফিনে আগুন ধরিয়ে কেটে পড়ার জন্যে এক ঘণ্টারও বেশি সময় পেয়েছে আরসনিস্ট ব্যাটা।'

'তার মানে আড়াইটার দিকে ধরানো হয়েছে মোমবাতিগুলো?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। কপালে গভীর চিন্তার ছাপ

'পাঁচ-দশ মিনিট এদিক-ওদিকও হতে পারে।'

'তা কি করে সম্ভব?' ভাজ্জব হয়ে গেল জ্যাকবাস। 'ওই সময় আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম এখানে বাউণ্ডারির ভেতর রাউণ্ডে ছিলাম আমি'

তাকে দেখল ডিটেকটিভ কয়েক সেকেণ্ড। 'একাই ছিলেন আপনি?'

'হ্যাঁ। ছয় বছর ধরে একাই এ কাজ করে আসছি আমি। কখনও একটা ইঁদুরও ঢুকতে পারেনি ভেতরে'

আনমনে মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা, জ্যাকবাসের বক্তব্য মনেপ্রাণে সমর্থন করে ও। আসলেই মানুষটা সদা সতর্ক। এই ক'বছরে এক মিনিটের জন্যেও পাহারাদারীর কাজে ফাঁকি দেয়নি জ্যাকবাস। অন্তত কেউ তোলেনি এ অভিযোগ প্রায়ই আকস্মিক ভাবে মাঝরাতে, কি ভোররাতে হানা দিয়ে তার কাজ দেখতে আসে এজেন্সির কেউ না কেউ। একবারও জ্যাকবাসকে অপ্রস্তুত অবস্থায় দেখা যায়নি। সব সময় দুই পায়ে খাড়া থাকে সে, অতন্দ্র প্রহরী।

হাসল বিয়ানকো। 'ইঁদুর ইঁদুর-ই, মিস্টার, মানুষ নয়। মানুষের মত কূট বুদ্ধি ইঁদুর পাবে কোথায়?'

'কিন্তু…'

'আপনার মনোভাব বুঝতে পারছি। দায়িত্ব পালনে আপনার শিথিলতা ছিল এমন মীন করিনি কিন্তু আমি। আমি বলতে চাইছি আপনি যখন সামনে ছিলেন, লোকটা বা লোকগুলো তখন পিছন দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে অথবা উল্টোটাও হতে পারে। মোট কথা ঢুকেছে ভেতরে কেউ না কেউ ইউ নো, চোর যখন ঘরে ঢোকার জন্যে সত্যিকারভাবে সিরিয়াস হয়ে ওঠে তখন তাকে ঠেকানো খুব মুশকিল।'

রাবারের সার্জিক্যাল গ্লাভস পরা হাতে এক টুকরো সেলুলয়েড নিয়ে নাড়াচাড়া করছে ফ্র্যাঙ্ক বিয়ানকো ওপাশের এক রুমের একটা উল্টানো টেবিলের তলা থেকে টুকরোটা উদ্ধার করেছে সে একটু আগে চার ইঞ্চিমত লম্বা হবে ওটা। দেখতে কালচে নেগেটিভের মত

'টেবিলটা উপুড় হয়ে এটার ওপর পড়েছিল বলে অক্ষত পাওয়া গেছে টুকরোটা,' বলল সে মাসুদ রানার উদ্দেশে 'সাজ্যাতিক দ্রুত পোড়ে এ জিনিস প্রমাণ সাইজ একটা রুমের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আগুন পৌঁছে দিতে পারে সেকেণ্ডের মধ্যে।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। তবে খুব একটা আমল দিচ্ছে না এখন ও করিগান ও বিয়ানকো, দু'জনেই নিজ নিজ পেশায় বিশেষজ্ঞ রানা এজেন্সিতে আগুন লাগানো হয়েছে ইচ্ছে করে, এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করে ছেড়েছে তারা রানা নিশ্চিত হয়েছে আরও আগেই। সেই থেকে ভীষণ গম্ভীর হয়ে আছে ও এখন শুধু দুটোই প্রশ্ন রানার, কে করেছে কাজটা, এবং কেন।

'আপনি কাউকে সন্দেহ করেন, স্যার?' প্রশ্ন করল ফায়ার ডিটেকটিভ

'নাহ!' মাথা দোলাল রানা। মনে মনে চাইছে তাড়াতাড়ি বিদেয় হোক এরা, তাহলে নিরিবিলিতে খানিক মাথা ঘামানো যাবে বিষয়টা নিয়ে

বারোটার দিকে রেহাই পাওয়া গেল দুই ডিটেকটিভের হাত থেকে যাওয়ার আগে সেলুলয়েডের টুকরোটা দেখিয়ে আশ্বস্ত করে গেছে বিয়ানকো, ওটায় যদি কারও আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়, তাহলে অপরাধীকে ধরা কোন সমস্যাই হবে না। রানাও সৌজন্যের খাতিরে মাথা দুলিয়ে ভাব করেছে যেন সফল হয় তারা, বের করতে সক্ষম হয় আরসনিস্ট ব্যাটার পরিচয়। যদিও মনে মনে নিশ্চিতভাবে জানে, কিছুই পাওয়া যাবে না ওটায় কোথাও আঙুলের ছাপ রেখে যাওয়ার মত বোকামি নিশ্চয়ই করেনি লোকটা বা লোকগুলো।

সন্ধে পর্যন্ত ধস্তাধস্তি করে রুমগুলোকে কোন রকমে গোছগাছ করে ফেলল ওরা সবাই মিলে। প্যাকেট লাঞ্চ আনিয়ে অফিসে বসেই খেয়ে নিয়েছে ওরা দুপুরে সবার মাথায় এক চিন্তা—কে করল কাজটা? কেন করল? প্রায় নীরবেই হাত চালাল ওরা পুরোটা সময় সাতটা বাজতে সবার ক্লান্তির কথা ভেবে ক্ষ্যান্ত দিল মাসুদ রানা

'আজ আর নয় কাল সকালে এসে যে যার অফিস রুম চেক করবে খুঁজে দেখবে জরুরী কোন ফাইল খোয়া গেছে কি না।'

শাখা প্রধান শওকত ছাড়া সবাই চলে গেল একে একে। ছোটখাট মানুষ শওকত। চোখে পুরু কাঁচের চশমা চেহারা ইন্টেলেকচুয়ালদের মত কম কথার মানুষ সে। 'আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না, মাসুদ ভাই,' বিড় বিড় করে বলল সে। 'অভাবনীয় একটা ব্যাপার।'

নিজের আধপোড়া ফাইল কেবিনেট খুলে ভেতরে উঁকি দিল রানা 'ঠিকই বলেছ। আমিও কিছু বুঝতে পারছি না।' ভেতরটা দেখে মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো ও। ফাইল সব অক্ষতই আছে, এবং যেভাবে সাজানো ছিল ঠিক সেভাবেই আছে সব অন্তত ওপর থেকে দেখে সেরকমই মনে হচ্ছে। এক আধটা খোয়া গেছে কি না, তা জানতে হলে ফাইল রেজিস্টারে চোখ বোলাতে হবে।

'শওকত, ফাইল রেজিস্টারটা নিয়ে এসো।'

চেহারা করুণ হয়ে উঠল শওকতের। 'ওটা নেই, মাসুদ ভাই ছাই হয়ে গেছে।'

'সেরেছে! ওটা না দেখে কি করে বুঝব সব ঠিক আছে কি না?'

'আমিও তাই ভাবছি,' মাথা চুলকাল শওকত। 'এর একমাত্র সলিউশন হলো কার কাছে কোন্ কোন্ ফাইল আছে, তার নতুন একটা তালিকা তৈরি করা।'

'সাঙ্ঘাতিক ঝামেলার কাজ।'

'ভাববেন না। লিস্ট তৈরির কাজে হাত লাগাচ্ছি আমি এখন। আপনার কেবিনেটের চাবি দিয়ে যান আমাকে।'

'বলো কি তুমি?' চোখ কপালে উঠল রানার। 'একা একা রাত জেগে এই পাহাড় ঘাঁটবে তুমি? কোন দরকার নেই। কাল সকালে আমরা সবাই মিলে হাত লাগাব এক সঙ্গে।'

'না। আজই শুরু করতে চাই আমি কাজটা। যেটুকু বাকি থাকবে আপনারা কাল সেরে ফেলবেন।'

মিনিট পাঁচেক তর্কাতর্কির পর শওকতের কাছে হার মানল মাসুদ রানা। চাবিটা তার হাতে তুলে দিয়ে বেরিয়ে এল ও অফিস ছেড়ে। দশ মিনিট পর ম্যানহাটনের ইস্ট সেভেন্টি থার্ড স্ট্রীটের পিছনের সমান্তরাল সেভেন্টি ফোর্থ স্ট্রীটের একটা আণ্ডারগ্রাউণ্ড কার পার্কে গাড়ি ঢোকাল রানা। তারপর পিছনের সংক্ষিপ্ত গলিপথ ধরে সেভেন্টি থার্ডের দু'শো ছেচল্লিশ নম্বর অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের ছয়তলায় নিজের ফ্ল্যাটে এসে ঢুকল। আসার পথে আজকের একটা নিউ ইয়র্ক পোস্ট কিনে এনেছে।

ওটা লিভিংরুমের সোফার ওপর ফেলে সোজা এসে বাথরুমে ঢুকল ও। গরম পানিতে দশ মিনিট ধরে গোসল করল, তারপর শেভ সেরে বেরিয়ে এল তরতাজা হয়ে এ মুহূর্তে অফিস নিয়ে ভাবছে না মাসুদ রানা, ভাবছে পেট নিয়ে। প্রচণ্ড খিদেয় নাড়ীভুঁড়ি হজম হয়ে যাওয়ার জোগাড়। কিচেনে এসে চারটে ডিমের প্রকাণ্ড এক ওমলেট তৈরি করল রানা। কফির জন্যে পানি বসিয়ে সরু ফালি করে কাটা টম্যাটো, ওমলেট আর পাউরুটি দিয়ে দুটো তাগড়া সাইজের স্যাণ্ডউইচ তৈরি করল। তারপর ধূমায়িত কফি ও স্যাণ্ডউইচ নিয়ে লিভিংরুমে এসে বসল

স্যাণ্ডউইচে বিরাট এক কামড় বসিয়ে পত্রিকাটা কোলের ওপর টেনে নিল ও চোখ বোলাতে লাগল আনমনে। প্রথম পাতার নিচের দিকে সাব-হেডিংসহ বড় একটা হেডিঙের ওপর চোখ পড়ল। জমে গেল নজর। ওটা এরকম:

কোটিপতি স্যান্ডলার পরিবারের সর্বশেষ সদস্য
ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার লোকান্তরে
রাজকীয় স্যান্ডলার ম্যানসনের লিভিংরুমে অশিতীপর নিঃসঙ্গ
ভিক্টোরিয়াকে মৃত পাওয়া গেছে

চোখ কোঁচকাল রানা। হেডিঙের নিচে ছোট করে ছাপা ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের ছবিটা দেখল কিছু সময় ধরে। তারপর নিচের বিস্তারিত রিপোর্ট পড়ায় মন দিল সঙ্গে হাত আর মুখও চলছে, তবে আগের তুলনায় অনেক ধীরগতিতে। রিপোর্টের সংক্ষিপ্তসার অনেকটা এরকম▯ ১৯৬৪ সালে আমেরিকার বিখ্যাত কোটিপতি,

অবিবাহিত আর্থার স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর তাঁর চিরকুমারী বোন, ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার একাই বাস করতেন তাঁদের ম্যানহাটনের এইটি নাইনথ স্ট্রীটের ঐতিহাসিক, প্রাসাদোপম বিশাল স্যাণ্ডলার ম্যানসনে। ভাইয়ের মৃত্যুর পর এখানে প্রায় আড়াই দশক একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দিন কাটিয়েছেন ভিক্টোরিয়া। মানসিক প্রতিবন্ধী ছিলেন তিনি।

অনেকের মতে আদরের একমাত্র ছোট ভাইয়ের হত্যাকাণ্ড চাক্ষুষ করার পর পুরোপুরি মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে মহিলার। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, কখনও এমনকি বছরও কাটিয়ে দিতেন তিনি একই পোশাকে। সারা বছর পুরু উলের মোজা আর পাম্প শু পরে থাকতেন। স্যান্ডলার ম্যানসনের বিভিন্ন রুমে মার্বেল ও জিঙ্কের তৈরি সাতটা প্রকাণ্ড বাথটাব থাকা সত্ত্বেও বছরের পর বছর গোসল করতেন না মহিলা। অ্যাকুয়াফোবিয়া ছিল তাঁর, পানি সম্পর্কে মারাত্মক মানসিক ভীতি ছিল। নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া পানি স্পর্শ পর্যন্ত করতেন না ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার।

কুকুর এবং এক ডলারের কড়কড়ে নতুন বিলের প্রতি প্রচণ্ড দুর্বলতা ছিল তাঁর। এক ডলারের বিল জমা করতেন তিনি আদরের ছোট ভাইকে দেয়ার জন্যে। তাঁর ধারণা একদিন ফিরে আসবে ছোট ভাই আর্থার স্যান্ডলার, টাকা চাইবে স্নেহময়ী বোনের কাছে, তখন ওগুলো তাকে দেবেন ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার। স্থানীয় দোকানদাররা খুব ভাল জানত মহিলার এই ধারণার কথা, যে কারণে তাঁর জন্যে কড়কড়ে এক ডলারের বিল সব সময় মজুদ রাখত তারা কেনাকাটা করতে এলে সব সময় বড় বিল দিতেন ভিক্টোরিয়া, বাকিটা এক ডলারের বিলে ফেরত দিতে হত তাঁকে। যদিও আমেরিকার প্রায় সবারই জানা আর্থার স্যান্ডলারের পরিণতির কথা।

এছাড়া অগুনতি কুকুর পুষতেন ভিক্টোরিয়া বেশিরভাগই ক্ষুদ্র আকারের লোমশ কুকুর ছিল ওগুলো। এবং প্রতিটিরই নাম রাখতেন তিনি অ্যান্ডি। সকাল-বিকাল রাজকীয় খাবার দেয়া হত অ্যান্ডিদের। কোন কুকুরের মৃত্যু হলে আখরোট গাছের কাঠ দিয়ে তার প্রতিকৃতি তৈরি করাতেন ভিক্টোরিয়া। তবে শেষ এক দশক কাঠের বদলে ভেলভেট কুশন দিয়ে ওগুলো তৈরি করিয়েছেন তিনি। ম্যানসনের ভেতরেই কোথাও আছে সে সব, কিন্তু কোথায় কেউ জানে না। স্যান্ডলার ম্যানসন সাধারণ নগরবাসীর কাছে যেমন চিররহস্যময়, তেমনি তার অধিবাসী স্যান্ডলারদের তিন পুরুষ। আজ পর্যন্ত কোন টিভি ক্যামেরা দূরে থাকুক, একজন সাংবাদিকও প্রবেশের সুযোগ পায়নি ওখানে। যে জন্যে ওই পরিবার সম্পর্কে খুব সামান্যই জানে মানুষ ইত্যাদি ইত্যাদি।

পত্রিকা রেখে সিগারেট ধরাল রানা। ভীষণ রকম চিন্তিত। উঠে গিয়ে টিভি অন করে দিল ও। খবর হচ্ছে। দেখছে অন্যমনস্ক রানা। এক মিনিট পর চমকে উঠল ও। আজ খুব ভোরে ওর-ই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনের রাস্তায় খুন হয়েছে এক যুবক, সেই খবর পড়ছে সংবাদ-পাঠক। আশ্চর্য হয়ে ভাবল রানা, এর কিছুই জানি না আমি! হত্যাকাণ্ডের সময়টা বিভ্রান্তিকর।

আশ্চর্যের ওপর আশ্চর্য!

দ্রুত বেরুবার জন্যে তৈরি হয়ে নিল রানা। এখনই যেতে হবে ওকে রানা এজেন্সিতে খুবই জরুরী

# দুই

বায়ুতাড়িত ভারি, ঘন তুষারপাতের মধ্যে দিয়ে সাইডওয়াক ধরে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলেছে মেয়েটি। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম তার নাম। মেয়েটির মাত্র বিশ গজ সামনে রয়েছে টকটকে লাল রঙের বিচ্ছিন্ন একটা মেপল পাতা, কিন্তু পরিষ্কার দেখা যায় না ওটা পোলের মাথায় একটা পতাকার সঙ্গে জোড়া আছে পাতাটা, ক্যানাডিয়ান পতাকা। ওটার পাতা বা লাল বর্ডার, কোনটিই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না

বিশ্রী আবহাওয়া, মনে মনে বলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। আরও বাড়িয়ে দিল চলার গতি। তাড়াতাড়ি নিজের ছোট, উষ্ণ অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে স্বস্তির দম ছাড়তে চায় সে। সমগ্র মনট্রিয়লে গত কয়েক দিন ধরে চলছে এই অবস্থা, পথে বের হওয়াই দায়। অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয় এটা। ডিসেম্বর-জানুয়ারির এই হচ্ছে এখানকার স্বাভাবিক আবহাওয়া এসব এখন আর লেসলির বিরক্তি উদ্রেক করতে পারে না। একজন মনট্রিয়লবাসীর মতই খাপ খাইয়ে নিয়েছে সে এর সঙ্গে

প্রতিদিন আট ইঞ্চি করে বরফ জমে এখন এ শহরে। কম করেও। কোন কোনদিন এক ফুটও ছাড়িয়ে যায় কুইবেকের সমস্ত অটোরুট বন্ধ এখন, কোন উপায় নেই গাড়ি চালানোর। এয়ারপোর্টও বন্ধ। ধপধপে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে আছে যেন শহরটা। ম্যাকগিল ইউনিভার্সিটি, ওয়েস্টমাউন্টের চূড়ায় বিখ্যাত ইলিউমিনেটেড ক্রস, পুরানো শহরের জ্যাকস কার্টারের সুউচ্চ পাথরের মূর্তি, সেইন্ট লরেন্সের সুপ্রাচীন গির্জা নোটর ডেম ডি বনসিকোর্স, সব বরফের পুরু স্তর গায়ে মেখে দাঁড়িয়ে আছে। অদ্ভুত লাগে দেখতে। ন্যাড়া গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে মাথায় কাঁধে বরফের বোঝা নিয়ে। যখন আর বইতে পারে না ভার, ঝুপ ঝুপ করে সব ঢেলে দেয় নিচে, তারপর আবার অপেক্ষা করে নতুন বোঝা ধারণের জন্যে

তাই বলে থেমে নেই শহরের জীবনযাত্রা। মাটির নিচে আছে আরেক মনট্রিয়ল, সবই চলছে সেখানে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টাই চালু আছে মেট্রো। বাজার, শপিং সেন্টার, কাফে-রেস্তোরাঁ চলছে ধুমসে ওপরে প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধে কুলিয়ে উঠতে না পেরে মাটির নিচে নেমে এসেছে মনট্রিয়লবাসী।

একটা বাঁক ঘুরল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, পরক্ষণেই তীব্র বাতাস আর তুষারের ধাক্কায় পড়ে যাওয়ার দশা হলো। বহু কষ্টে সামাল দিল সে। ইচ্ছে করলে আণ্ডারগ্রাউণ্ড দিয়েই আসতে পারত সে কিন্তু আসেনি কারণ তার কর্মস্থল, ম্যাকগিল ভার্সিটি, বাসার কাছেই, কয়েক ব্লক দূরে আরও এক বছর কাটাতে হবে লেসলিকে এখানে, আরও একটা থিসিস শেষ করতে হবে। তারপর ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করবে সে

বাসায় ঢুকে মাথা এবং ওভারকোটের দুই কাঁধে জমে ওঠা তুষার ঝেড়ে ফেলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। ভেতরের গরম পরিবেশে আসতে পেরে যেন নতুন জীবন লাভ করেছে সে। মনে মনে ক্যানাডিয়ান তেলের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল লেসলি তার জন্মস্থান, ইংল্যাণ্ডের এক্সিটারে ঘর গরম রাখার জন্যে ব্যবহৃত কাঠ আর কয়লার থেকে অনেক সস্তা আর নির্ভরযোগ্য এদের এই সম্পদ

গলায় পেঁচানো স্কার্ফটা খুলল লেসলি, তারপর উলের হ্যাট। ওগুলোও ঝাড়ল সে। কাঁধে ছড়িয়ে পড়ল তার একরাশ ঘন, বাদামী চুল। ভেজা কাপড় শুকোবার জন্যে বাথরুমের টাবের ওপর টাঙানো দড়িতে মেলে দিল লেসলি। হ্যাটটা ওরই সঙ্গে ঝোলানো একটা ক্লিপে আটকে দিল। কেএলএইচ সিস্টেমে মোজার্টের একটা কনসার্ট চাপাল সে; তারপর ধূমায়িত ভারতীয় চায়ে চুমুক দিল। মনটা অতীতে হারিয়ে গেল লেসলির।

নজর ঘরের দেয়ালে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর দুর্লভ কয়েকটা প্যাস্টেল শেডেড পেইন্টিং ঝুলছে দেয়ালে, আনমনে সেগুলো দেখছে। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম নিজেও একজন আর্টিস্ট। খুব ভাল নয় অবশ্য, মোটামুটি শিশুকালটা যদি একটা দোদুল্যমান, অনিশ্চয়তার মধ্যে না কাটত ওর, তাহলে আজ হয়তো নাম করা আর্টিস্ট হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে পারত লেসলি সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, পিতার মত তার হাতেরও ঐশ্বরিক ক্ষমতা রয়েছে সুযোগ পেলে শিল্প পিপাসুদের অনেক কিছু দিতে পারে সে। কিন্তু…দুর্ভাগ্য

নিজেকে প্রকাশ করার কোন ঝুঁকি নিতে পারে না লেসলি। এখনও সে সময় আসেনি। চা শেষ করে উঠল লেসলি। বেডরুমে এসে ঢুকল; ও ঘর থেকে মিউজিকের আওয়াজ আসছে। চাপা হলেও বোঝার জন্যে যথেষ্ট। বড় জানালার সামনে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকল লেসলি, বাইরের তুষারপাত দেখল ভীষণরকম প্রতিকূল আবহাওয়া। তবু উপায় নেই তার এর মধ্যেই যাত্রা করতে হবে

ক্লজিট থেকে একটা সিঙ্গল সুটকেস বের করল মেয়েটি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ দেশ ত্যাগ করতেই হবে তাকে চলতি সেমিস্টারের শেষ দুটো সপ্তাহ মিস করবে লেসলি, কিন্তু তবু যেতে হবে তার প্রফেসরেরা সমস্যাটা বোঝার চেষ্টা করবেন, আশা করছে সে। ওদিকে যদি সব ভালয় ভালয় মিটে যায়, এর মধ্যে ফিরে আসবে লেসলি, তাড়াতাড়ি বাকি থিসিস শেষ করে জমা দেবে

সুটকেস খুলে কাপড়-চোপড় ভরতে লাগল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম আমেরিকায় যাচ্ছে সে। নিউ ইয়র্কে। কিছু অসমাপ্ত পারিবারিক কাজ পড়ে গেছে, ওগুলো সারতে। আর ক'টা দিন পর যদি মরত ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার, বড্ড উপকার হত ওর। শেষ মুহূর্তের কাজ বন্ধ রেখে হুড়োহুড়ি করে ছুটতে হত না তাকে

কেন এমন কাজ করল লোকটা? বিয়ের আংটি খুলে পকেটে কেন রাখল? এর দ্বিতীয় কোন কারণ খুঁজে পেল না সাশাদ বা হেরেন তাদের মতে এর একটাই কারণ হতে পারে, এবং সেটা অবশ্যই একমাত্র কারণ: তা হলো, স্ত্রী ছাড়া আরও এক নারী আছে তার জীবনে মানে, ছিল আর কি। এক নারী? না কি…যাই

হোক, সেটাও এখন আর বড় কথা নয়। আংটিটা বেশ দামী। ব্যাণ্ডে এনগ্রেভ করা আছে কয়েকটা অক্ষর ও বিয়ের তারিখ কে. এফ- এম. আর। ৬ ডিসেম্বর, ১৯৮২।

বিকেল তিনটায় নিহতের ময়না তদন্তের রিপোর্ট পৌঁছল নাইনটিনথ প্রিসিঙ্কটে, ডিটেকটিভ অ্যারাম সাশাদের হাতে। রিপোর্ট পড়ে সন্তুষ্টচিত্তে মাথা দোলাল সে। তার ধারণাই ঠিক। মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেই সহবাস করেছে যুবক।

'ওই জিনিসটা,' কাগজটা হেরেনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে দার্শনিকের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সাশাদ। 'যে জায়গায় খাটানোর কথা সেখানেই যদি খাটাত, তাহলে হয়তো প্রাণ হারাতে হতো না বেচারীকে। অজায়গায় খাটাতে গিয়েই গেল ব্যাটা।'

কাগজটার ওপর চোখ বোলাল হেরেন। তারপর ফিরিয়ে দিল। 'তাই তো মনে হয়।'

'আবার মনে হয় কি? মনে হওয়া-টওয়ার কিছু নেই। আমি যা বললাম, ঠিক তাই ঘটেছে। বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। লিখে রাখো, তিনটে পর্যন্ত কুকাজ করেছে ব্যাটা। তারপর কাপড় পরে বেরিয়েছে ওই বিল্ডিঙেরই কোন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে; এবং পথে নেমেই পড়েছে রিসেপশন কমিটির সামনে।' খানিক বিরতি দিল সাশাদ। 'কিন্তু ওইরকম সময় কেন পথে বের হলো সে? যেখানে ছিল, বাকি রাতটা সেখানেই কেন থেকে গেল না? বউয়ের ভয়ে?'

'বউ তার আছে কি নেই তাই বা কে জানে?'

'আছে। নইলে বিয়ের আংটি সঙ্গে নিয়ে ঘুরবে কেন সে?'

'হয়তো অভ্যাস,' কাঁধ ঝাঁকাল হেরেন।

'উঁহুঁ! মিলছে না। আমার ধারণা…'

সন্তুষ্ট হতে পারছে না দুই ডিটেকটিভ। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে তারা বিষয়টা নিয়ে। টেনিস বলের মত একজন একটা আইডিয়া ছুঁড়ে দিচ্ছে, অন্যজন তা ফিরিয়ে দিয়ে আরেক আইডিয়া ছুঁড়ছে। একসঙ্গে বেশ কয়েক বছর কাজ করেছে এরা, অপরাধ-রহস্য উদঘাটনের এই 'সক্রেটিক মেথডকে' প্রায় ফাইন আর্টের পর্যায়ে নিয়ে এসেছে তারা এভাবে পরস্পরের মধ্যে আইডিয়া চালাচালির মাধ্যমে।

'কেন অত রাতে পথে বের হলো সে?' সাশাদের একটু আগের প্রশ্নটা উচ্চারিত হলো হেরেনের কণ্ঠে। চেয়ারে হেলান দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে সে।

'তোমার ধারণাটা শুনি!'

'হয়তো মেয়েটির, মানে, নিহতের গার্লফ্রেণ্ডের স্বামী হতে পারে আকস্মিকভাবে ফিরে আসে বলে। হয়তো শহরের বাইরে ছিল সে, ফেরার কথা ছিল না রাতে। কিন্তু হঠাৎ করে…'

'অথবা,' বাধা দিল সাশাদ। 'হয়তো পুরো রাতের পয়সা পে করেনি সে মেয়েটিকে। অর্ধেক রাতের জন্যে ভাড়া করেছিল।'

দুটো পয়েন্টই পছন্দ হলো ওদের। তাই ও দুটো নিয়েই জাবর কাটতে লাগল সাশাদ-হেরেন। 'এখনও লোকটার নাম জানা গেল না,' এক সময় বলে

উঠল সাশাদ। 'ওটা জানা গেলে আংটির ব্যাপারটা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যেত।'

ওদিকে, চারশো চল্লিশ ম্যাডিসন অ্যাভিনিউ, ব্র্যাডফোর্ডের এক অর্থ লগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান মেহর অ্যাণ্ড কোম্পানির এক জুনিয়র অ্যাকাউন্টস নির্বাহীর খবর নেই। দুপুর গড়িয়ে যায় তবু সে অফিসে আসছে না দেখে তার শহরতলীর বাসায় টেলিফোন করল অফিসের এক সেক্রেটারি। টেলিফোন ধরল তার স্ত্রী, এবং অপর প্রান্তের প্রশ্ন শুনে জবাব দিল, না, তার স্বামী গতরাতে বাসায় ফেরেনি।

কাল দুপুরে ফোন করে বাসায় সে বলেই রেখেছিল যে রাতে সে আসছে না। বলেছিল অফিসে খুব জরুরী কিছু কাজ জমে গেছে হঠাৎ করে, ওগুলো তাড়াতাড়ি না সারলেই নয়। কাজ শেষ করতে করতে রাত হয়ে যাবে অনেক, তাই রাতে পথে বের হওয়ার ঝুঁকি নেবে না নির্বাহী। তাতে বিপদ ঘটতে পারে। রাতটা ম্যানহাটন ভার্সিটি ক্লাবে কাটাবে বলেছিল সে। কেন, কোন ঝামেলা হয়েছে?

না, কোন ঝামেলা হয়নি। লাইন কেটে ক্লাবে ফোন করল সেক্রেটারি। জানা গেল সেখানে যায়নি নির্বাহী গত রাতে। কোথায় গেল তাহলে মানুষটা? কেন বাসায় মিথ্যে বলল সে? একটার সময় মেহর অ্যাণ্ড কোম্পানির তরফ থেকে বিষয়টা জানানো হলো নিউ ইয়র্ক সিটি পুলিস ডিপার্টমেন্টের মিসিং পারসন'স সেকশনে। ফ্যাক্সের মাধ্যমে মুহূর্তে সবখানে ছড়িয়ে গেল খবরটা। হাসপাতাল, পুলিস স্টেশন, শহরে যত মর্গ আছে, সর্বত্র।

তিনটে বিশে সাশাদের ডেস্কের টেলিফোন বেজে উঠল। ফোনটা করেছে ভোর রাতে সেভেন্টি থার্ড স্ট্রীটে জবাই হওয়া অজ্ঞাতপরিচয় যুবককে যে মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়, তার ল্যাব অ্যাসিসটেন্ট গ্যারি ডেভমারশ।

'আপনার পাঠানো লাশটার পরিচয় সম্ভবত পাওয়া গেছে, অফিসার,' বলল সে। 'অন্তত তার ডেসক্রিপশন সেরকমই বলে।'

চট করে আংটিটা চোখের সামনে তুলে ধরল অ্যারাম সাশাদ 'কি নাম?'

'মার্ক রাইডার।'

'ধন্যবাদ। নামটাও মিলে গেছে মনে হয় রিসিভার রেখে দিল সাশাদ। আংটির ব্যাণ্ডের খোদাই করা অক্ষরগুলো দেখল আবার তারপর মাথা ঝাঁকাল হেরেনের উদ্দেশে 'এতক্ষণে আত্মপরিচয় জানাল লাশটা

রানা এজেন্সি। নিজের রুমে বসে আছে মাসুদ রানা। তার মুখোমুখি শওকত। আনমনে শওকতের পিছনের কালচে পোড়া দাগ ভরা দেয়াল দেখছে রানা, শওকত দেখছে রানাকে। কথা নেই কারও মুখে।

আধ ঘণ্টা আগে হঠাৎ করেই ফিরে এসেছে রানা। নিজের ফাইল কেবিনেটের মধ্যে কিছু একটা খুঁজেছে হন্যে হয়ে। তন্নতন্ন করে। কিন্তু পাওয়া যায়নি জিনিসটা। সেটা কি জানে না শওকত জানার আগ্রহে ছটফট করছে ভেতরে ভেতরে কিন্তু মাসুদ ভাইকে প্রশ্ন করতে সাহস হচ্ছে না তার। ভীষণ রকম গম্ভীর হয়ে আছে রানা। হাত গুটিয়ে বসে আছে শওকত কখন মাসুদ ভাই মুখ খুলবেন সেই আশায়।

সচকিত হলো মাসুদ রানা। নড়েচড়ে বসল দৃষ্টি নেমে এল শওকতের

মুখের ওপর। মুচকে হাসল রানা। 'খুব অস্থির হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে?'

মুখে কিছু বলল না ইন্টেলেকচুয়াল। তবে চেহারায় বুঝিয়ে দিল ঠিকই ধরেছেন আপনি। শুধু অস্থির নয়, সাজ্ঞাতিক অস্থির হয়ে আছি।

'আমি জানি কেন আগুন লাগানো হয়েছে আমাদের অফিসে,' বলল মাসুদ রানা।

'জ্বি?' শিরদাঁড়া সোজা হয়ে গেল শওকতের। পুরু চশমার নিচে কুঁচকে উঠল তার দু'চোখ।

'হ্যাঁ। আমার ফাইল কেবিনেট থেকে বিশেষ একটা ফাইল সরিয়েছে কেউ, এবং ব্যাপারটা যাতে প্রকাশ না পায় সে জন্যে আগুন লাগিয়ে সব পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চেয়েছিল যাতে আমরা ধরে নিতে বাধ্য হই আর সব ফাইলের মত ওটাও ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওদের। ওরা বুঝতে পারেনি সতর্ক জ্যাকবাসের কারণে পরিকল্পনার শেষ অংশ এভাবে কেঁচে যাবে।'

চোখ পিট পিট করে উঠল শওকতের। বিভ্রান্ত ভঙ্গি। 'বুঝলাম না, মাসুদ ভাই। কোন ফাইল সরিয়ে ফেলা হয়েছে? কে করল কাজটা?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। তোমার শেষ প্রশ্নের উত্তর এখনই দিতে পারছি না। কারণ, জানি না। তবে প্রথমটার ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে পারি,' ঠোঁট টিপে হাসল ও। 'গল্পটা শুনতে মন্দ লাগবে না তোমার।'

অস্থিরতা আরও বেড়ে গেল শওকতের 'তাহলে আর দেরি কেন? শুরু করে দিন, প্লীজ!'

'এখনই?'

'হ্যাঁ, এখনই। দম আটকে আসছে আমার।'

'বেশ।' সিগারেট ধরিয়ে নাক-মুখ দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগল মাসুদ রানা। বক্তব্য গোছাচ্ছে মনে মনে। 'এ শহরের এক সময়ের বিখ্যাত অ্যাটর্নি উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলসের নাম শুনেছ কখনও? শুধু বিখ্যাত নয়, খুবই বিখ্যাত ছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর মত দিনকে রাত করতে সক্ষম কোন অ্যাটর্নি গোটা আমেরিকায় দ্বিতীয়টি ছিল না। সাক্ষী-সাবুদ আর তথ্য প্রমাণের জোরে অনেক জঘন্য অপধারীকেও নিশ্চিত মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আসার ব্যাপারে রীতিমত ওস্তাদ ছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস। এবং মজার কথা হলো, তাঁর ব্যাপারে একটা গুজব খুব জোরেসোরে চালু ছিল, তিনি যে সব সাক্ষী-প্রমাণ হাজির করতেন তার বেশিরভাগই ছিল ভুয়া। সোজা কথায় বানানো। শুনেছ?'

মাথা নাড়ল শওকত ইতস্তত ভঙ্গিতে। 'খুব সম্ভব শুনেছি ভদ্রলোকের কথা, মাসুদ ভাই। খেয়াল পড়ছে না।' একটু বিরতি। 'ভুয়া সাক্ষী-প্রমাণের সাহায্যে আসামী মুক্ত করাতেন ভদ্রলোক? তা-ও এ দেশে?'

'হ্যাঁ। এ দেশেই।'

'প্রশাসন জানত?'

'জানত হয়তো। সঠিক বলতে পারি না। তবে গুজবটা যেমন জোরাল ছিল, তাতে প্রশাসনের না জানার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। অবশ্য

আমি পুরোপুরি নিশ্চিত নই, যা শুনেছি তাই বললাম। তবে একটা কথা ঠিক, রাষ্ট্র বনাম অমুক জঘন্য চোরাকারবারী, কি তমুক নৃশংস হত্যাকারী জাতীয় মামলার শতকরা একশো ভাগই তাঁর হাতে পড়ত। এর মধ্যে যে-সব মামলা খুব আলোড়ন সৃষ্টি করত, আসামীর রেহাই পাওয়ার কোন পথই আর নেই মনে হত, ঠিক সেগুলোরই গতি শেষ মুহূর্তে কি করে যেন উল্টে যেত। বেকসুর খালাস পেয়ে যেত আসামী। ড্যানিয়েলসের সঙ্গী ছিলেন একজন, অ্যাডলফ জেঙ্গার। ব্যবসায়িক অংশীদার। তিনিও নাম করা আইনজীবী, কিন্তু ড্যানিয়েলসের অগাধ জ্ঞান, যোগ্যতার তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে ছিলেন তিনি। কোন তুলনাই হত না ওদের। কিছু কিছু মামলার কথা আমি জানি। বেশিদিন নয়, এই ধরো আট-দশ বছর আগের কথা। রীতিমত অঘটন ঘটিয়ে দিতেন ভদ্রলোক কোর্টে।' আঙুলের কর গুনল মাসুদ রানা। 'ছ'বছর পাঁচ মাস হলো মারা গেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস।'

'আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হলো কিভাবে?'

'একটা জটিল মামলায় তাঁর সাহায্য নিতে হয়েছিল আমাকে সেই সময় পরিচয়। সে দশ বছর আগের কথা।'

'তাই?' বলল শওকত।

'হ্যাঁ।' আবার সিগারেট ধরাল রানা। 'মৃত্যুর মাস দেড়েক আগে একদিন গভীর রাতে এসেছিলেন ড্যানিয়েলস আমার কাছে। খুব গোপনে ' শ্রাগ করল ও। 'কিন্তু ব্যাপারটা যে গোপন ছিল না, এই অগ্নিকাণ্ডই তার প্রমাণ

আবার ধাঁধায় পড়ে গেল শওকত। 'গভীর রাতে, গোপনে…কেন?'

সামনে ঝুঁকে টেবিলে দুই কনুইয়ের ভর রেখে বসল মাসুদ রানা দু'হাত এক করে মুঠো পাকিয়ে থুতনি রাখল তার ওপর। 'আমার জিম্মায় কিছু কাগজপত্র রেখে যেতে।'

'কিসের কাগজপত্র?'

মুহূর্তের জন্যে আনমনা হয়ে পড়ল রানা। 'জানি না। কোনদিন হয়তো জানা হবেও না। নেই তো সে সবের কিছু, কি করে জানব? সব নিয়ে গেছে।'

চুপ করে থাকল শওকত।

'গলার ক্যান্সারে মারা গেছেন ড্যানিয়েলস যেদিন ডাক্তার তাঁর আয়ুর সময়সীমা প্রকাশ করে, তার পরদিনই আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তিনি। হাতে ছিল সীলগালা করা বড় একটা প্যাকেট। ভেতরে প্যাড জোড়া প্যাকেট। যথেষ্ট বয়স হয়েছিল ভদ্রলোকের, পঁচাত্তরের মত। তার ওপর ক্যান্সারের আক্রমণ, ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন মৃত্যুর আগে। কথা বলতেন ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে, সব বোঝা যেত না স্পষ্ট। মোটা ছড়ির সাহায্য ছাড়া হাঁটতে পারতেন না; তারপরও এক পা যেতে দু'মিনিট জিরিয়ে নিতে হতো। আমার হাতে প্যাকেটটা প্রায় জোর করে গুঁজে দিয়েছিলেন ড্যানিয়েলস।'

'জোর করে কেন?'

'ওর মধ্যে একটা উইল ছিল, আর ছিল দুটো চিঠি। বিষয়টা বেশ জটিল, তাছাড়া কোর্ট-কাচারীর ব্যাপার, তাই প্রথমে নিতে চাইনি আমি '

'কোর্ট-কাচারীর ব্যাপার এখানে কেন নিয়ে এলেন তিনি?'

'বলছি। আজকের পত্রিকা নিশ্চই দেখার সুযোগ পাওনি তুমি?'

'সময় পেলাম কোথায়?'

'ঠিক। আমিও পেতাম না যদি তুমি জোর করে আমাকে বাসায় না পাঠাতে। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য যা-ই হোক, দেরিতে হলেও নিউ ইয়র্ক টাইমসে চোখ বোলাবার সুযোগ হয়েছে আমার। ওতে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা খবর ছিল আমার জন্যে।'

'আপনার জন্যে?'

'হ্যাঁ।'

'কি খবর?'

'কোটিপতি স্যান্ডলার পরিবারের শেষ ওয়ারিশ, ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর খবর উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস ছিলেন স্যান্ডলারদের ঘনিষ্ঠ পারিবারিক বন্ধু-কাম-অভিভাবক। বহু বছর ওদের হয়ে মামলা-মোকদ্দমা লড়েছেন ড্যানিয়েলস, সাহায্য করেছেন ওদের নানানভাবে। ওদের যত সম্পত্তি জমি-জমা ইত্যাদি আছে, সবকিছুর দলিল ছিল তাঁর জিম্মায়। ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার অপ্রকৃতিস্থ ছিলেন বলে ওসব নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন ড্যানিয়েলস। হয়তো তাঁকে স্যান্ডলার এস্টেট পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে গেছেন ভিক্টোরিয়ার ছোট ভাই আর্থার স্যান্ডলার, তাঁর মৃত্যুর আগে, ঠিক জানি না আমি। '৬৪ সালে ম্যানহাটনে অজ্ঞাতপরিচয় জনাকয়েক বন্দুকধারীর গুলিতে নিহত হন আর্থার স্যান্ডলার ম্যানসনের সামনে।

'সে যাই হোক। সে রাতে ড্যানিয়েলস নিজে থেকেই এ সব তথ্যের কিছু কিছু আমাকে জানান। প্রশ্ন করলে হয়তো বিস্তারিত জানা যেত, কিন্তু কথা বলতে ভদ্রলোকের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে দেখে বিশেষ জোর করিনি আমি। যেটুকু বলতে পেরেছেন সেটুকু শুনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে আমাকে। ড্যানিয়েলস আমাকে একান্ত অনুরোধ করেন, আমি যেন খামটা আমার নিরাপদ জিম্মায় রাখি আমি যত এসব ঝামেলা রাখতে পারব না বলি, তিনিও ততই নাছোড়বান্দার মত অনুনয়-বিনয় করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আর না পেরে নিলাম ওটা।'

'কিন্তু রানা এজেন্সি কেন...'

'সেটাই বলছি এখন। ড্যানিয়েলসের মতে, তাঁর ক্যান্সারের বিষয়টা জানাজানি হওয়ার পর তাঁকে ঘিরে বেশ কিছু রহস্যময় ঘটনা ঘটতে শুরু করে। সারাক্ষণ কারা যেন অনুসরণ করে তাঁকে, যেখানে যান, এমন কি ডাক্তারের কাছে গেলেও পিছু লেগে থাকে তারা। খুব যে টাকা-পয়সার মালিক ড্যানিয়েলস তেমনও নয়। স্যান্ডলারদের দলিল দস্তাবেজ ছাড়া সেরকম মূল্যবান কিছু ছিলও না তাঁর কাছে তাই ড্যানিয়েলস সন্দেহ করলেন ওরা হয়তো ওগুলোই কবজা করার ফিকিরে লেগেছে।

'ভাবনায় পড়ে গেলেন অ্যাটর্নি। আর কোন ঘনিষ্ঠ আইন-জীবীকে স্যান্ডলার এস্টেট পরিচালনার পাওয়ার অভ অ্যাটর্নি দেবেন, সাহস হয় না হয়তো শেষ পর্যন্ত রক্ষকই ভক্ষক হয়ে দাঁড়াবে। আইনজীবীদের মধ্যে নাকি খুব প্রচলিত

একটা প্রবাদ আছে, "তুমি ছোট আইনজীবী হও, বা বড়, তোমার সহকর্মী আইনজীবীকেও কখনও বিশ্বাস কোরো না। কখনও না" ব্যাংকের ভল্টে রাখবেন, সে ভরসাও হয় না শেষ পর্যন্ত কোন পথ না পেয়ে অনেক ভেবেচিন্তে রানা এজেন্সির শরণাপন্ন হন ড্যানিয়েলস।'

'তারপর?'

'আমাকে তিনি অনুরোধ করে গেছেন, ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর যেন আমি খামটা খুলি। ওর মধ্যে আরও দুটো ছোট খাম ছিল। একটায় আমাকে লেখা ড্যানিয়েলসের চিঠি ছিল। অন্যটায় ছিল তাঁর প্রাক্তন ব্যবসায়িক পার্টনার স্যাডলফ জেঙ্গারকে লেখা আরেকটা চিঠি।'

'তার মানে আপনাকে ওগুলো গছানোর জন্যে পুরোপুরি তৈরি হয়েই এসেছিলেন ড্যানিয়েলস!'

'নিশ্চই আগেই বলেছি কাজটা আমি নিতাম না। তারপরও নিয়েছি, ড্যানিয়েলসের একটা সদিচ্ছা আছে অনুমান করে।'

'কি সদিচ্ছা?'

'জানি না। সেটা সঠিক সময়ে খাম খুলে আমাকে লেখা তাঁর চিঠি পড়ে জানার কথা ছিল। ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর কিন্তু··· কথায় কথায় সেদিন ড্যানিয়েলস বলেছিলেন, "সারাজীবন একের পর এক পাপ করেছি; মৃত্যুর আগে অন্তত একটা ভাল কাজ করে যেতে পারলাম, এই বিশ্বাস নিয়ে শান্তিতে মরতে চাই আমি।" '

'সেই ভাল কাজটা কি?'

'স্যান্ডলারদের দলিলপত্রের নিরাপত্তা বিধান করা এবং বিশ্বস্ত কারও কাছে হস্তান্তর করে যাওয়া।'

'ও!'

'আমার মনে হয় ওতে এমন কিছু ছিল যা ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর আগে জানাজানি হোক চাননি ড্যানিয়েলস। ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-পরবর্তী সময়ের সঙ্গে হয়তো কোন যোগসূত্র···'

'আমি অন্য একটা সম্ভাবনার কথা ভাবছি, মাসুদ ভাই

'কি?'

'সেই খামটা আজই খোয়া গেছে কেন ভাবছি আমরা?'

চোখ বুজল রানা। 'বলে যাও।'

'কাজটা আরও আগেই তো ঘটিয়ে থাকতে পারে কেউ মহিলার মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর আগুনটাই কেবল লাগানো হয়েছে! কাজটা যে বা যারা করেছে, তারা অবশ্যই জানত কখন প্যাকেটটা খুলবেন আপনি, তাই সময়মত শুধুই অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন করেছে ওরা আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্যে হতে পারে না? আজকের কাগজে বেরিয়েছে মহিলার মৃত্যুর সংবাদ, অর্থাৎ গতকাল মৃত্যু হয়েছে তাঁর। আগুনটাও লেগেছে কাল ভোর রাতেই।'

'কারেক্ট,' চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রানা 'হতে পারে। ড্যানিয়েলসের স্যান্ডলারদের দলিল আমার হাতে তুলে দেয়ার খবর যখন জানাই ছিল, তখন ওটা

নিশ্চই অনেক আগেই হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। নিতে যখন হবেই, শুধু শুধু ফেলে রেখে বেহাত হতে দেয়ার ঝুঁকি নেয়া কেন? ঠিক বলেছ, শওকত। আগেই লোপাট করা হয়েছে ওগুলো। এবং আমাদের ভুল ভাবতে সাহায্য করার জন্যে আজ লাগানো হয়েছে আগুন। সে না হয় হলো। কিন্তু স্যান্ডলার পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তির দলিল চুরি করে কার কি লাভ হবে বুঝতে পারছি না।'

'কারও হবে নিশ্চই কিছু। নইলে কেন ও-কাজ করতে যাবে?'

'ঝামেলা! জানার চেষ্টা করতে হবে কি ছিল ওই দলিলের বক্তব্য

'কি করে জানবেন?'

'অ্যাডলফ জেঙ্গারের সঙ্গে দেখা করব আমি।'

'ও হ্যাঁ, তাই তো! কিন্তু সে আছে না মরে গেছে কে জানে!'

'জানতে হবে।'

'কোথায় থাকেন ভদ্রলোক?'

'নানটুকেট। ম্যাসাচুসেটস।'

আরও একটা সিগারেট ধ্বংস করল চিন্তিত মাসুদ রানা। অন্য একটা বিষয় নিয়ে ভাবছে ও। ভাবছে ওরই অ্যাপার্টমেন্ট হাউসের সামনে এক যুবকের খুন হওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে। মনে আছে, জ্যাকবাসের ফোন পেয়ে সাড়ে তিনটায় বেরিয়েছে রানা বাসা থেকে। আর প্রায় একই সময় খুন হয়েছে যুবকটি ভেবে দেখার মত বিষয়। প্রায় একই সময় বাড়ির পিছনের গলি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে সে আর ওই যুবক বেরিয়েছে সামনে দিয়ে। যুবকের মৃত্যু সম্পর্কে খবর নিতে হবে, ভাবল রানা। আপাতত থাক সে চিন্তা।

'কেবিনেটের ওপরের ড্রয়ারে রেখেছিলাম আমি খামটা,' আবছা ইঙ্গিতে নিজের ফাইল কেবিনেট দেখাল রানা। 'বেশ কয়েক বছর আগের কথা, প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। তবে ওখানেই যে ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার নেই খামটা। সব আছে, কেবল ওটা নেই।'

চোখ কুঁচকে পায়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছে শওকত। ডান পায়ের তালু দিয়ে মৃদু থপ থপ শব্দে তাল ঠুকছে মেঝেতে 'আমাদের মধ্যে কি কোন ফুটো আছে? বাইরের কারও পক্ষে এখান থেকে কিছু সরানো কি করে সম্ভব?'

'ভাল প্রশ্ন করেছ,' বলল রানা। 'এসো, বিষয়টা নিয়ে আরেকটু খোলাখুলি আলোচনা করা যাক।'

# তিন

দু'দিন পর।

বিকেল চারটা। নয় নম্বর পার্ক অ্যাভিনিউ সাউথ, রানা এজেন্সির গেটের সামনে এসে দাঁড়াল একটি ট্যাক্সি। ভেতর থেকে নামল চব্বিশ-পঁচিশ বছরের এক যুবতী। উচ্চতা মাঝারি। পরনে রয়্যাল ব্লু স্কার্ট, কলারওয়ালা হালকা নীল প্রিন্ট ব্লাউজ, তারওপর দামী উটের পশমের কোট। গলায় পেঁচানো আছে সাদা

স্কার্ফ। কাঁধে বড়সড়, পেট মোটা একটা ব্যাগ।

ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটি। গেট পেরিয়ে দৃঢ়পায়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। এক মিনিট পর শাখা প্রধান শওকতের সঙ্গে মাসুদ রানার বন্ধ দরজার সামনে দেখা গেল যুবতীকে। বিনা বাক্য ব্যয়ে তাকে রানার রুমে ঢুকিয়ে দিয়ে ফিরে গেল শওকত। ভেতরে এসে দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল মেয়েটি। ব্যস্ত মাসুদ রানাকে দেখল ভাল করে।

কোট খুলে রেখেছে মাসুদ রানা। গলায় টাই নেই। চুল এলোমেলো। শার্টের হাতা তুলে কনুইয়ের ওপর গোটানো। হাত নোংরা। মেয়েটির অপ্রস্তুত হওয়ার কারণ বুঝতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল রানার। লজ্জিত হাসি দিল ও। 'দুঃখিত। অফিসে হঠাৎ একটা ঝামেলা বেধে যাওয়ায় এলোমেলো অবস্থায় আছি আমরা। কিছু মনে করবেন না, আপনি আমার কাছেই এসেছেন?'

'হ্যাঁ,' রানার চোখে চোখ রেখে বলল মেয়েটি। 'যদি আপনি সত্যি মাসুদ রানা হয়ে থাকেন।'

খেয়াল করল ও, ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলছে যুবতী হাসল 'আপনার সন্দেহ হলে আমার বার্থ সার্টিফিকেট, পাসপোর্ট, সব দেখাতে পারি।'

মৃদু হাসি ফুটল যুবতীর মুখে। 'তার কোন দরকার নেই।'

'বাঁচালেন! দুটোর একটাও এ মুহূর্তে সঙ্গে নেই কি না! আপনি বসুন, প্লীজ। আমি আসছি।' দ্রুত পায়ে অ্যাটাচড বাথরুমে গিয়ে ঢুকল রানা। তিন মিনিট পর চেহারা ভদ্রোচিত বানিয়ে বেরিয়ে এল। গদিমোড়া আর্ম চেয়ারে পিঠ খাড়া করে বসে আছে মেয়েটি।

'মনে হয় অসময়ে এসে ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি আপনাকে?' বলল সে

'ও নিয়ে ভাববেন না।' মেয়েটির মুখোমুখি নিজের প্রকাণ্ড সুইভেল চেয়ারে বসল মাসুদ রানা।

'অফিস বদল করছেন?'

'না। নতুন করে সাজাবার কাজ করছি।'

'তাহলে তো সত্যিই অসুবিধায় ফেলে দিলাম দেখছি!' আনমনে বলল যুবতী। চোখে-মুখে দ্বিধান্বিত ভঙ্গি ফুটে উঠেছে

একভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। কথাবার্তা, ভাবভঙ্গি দেখে বোঝা যায় যথেষ্ট শিক্ষিত এ মেয়ে এবং তেমনি চটপটে। চেহারাটা মিষ্টি। এমন চেহারা কোন নামী-দামী ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদেই ভাল মানায় 'আপনার আগমনের কারণটা বলবেন দয়া করে?'

'ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যু,' রানার মতই ওর চোখে চোখ রেখে বলল যুবতী।

কপালে দুটো চিকন ভাঁজ পড়ল মাসুদ রানার 'মাফ করবেন!'

'ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের এক ভাই ছিল, আর্থার স্যান্ডলার।'

'হ্যাঁ, শুনেছি।' ভাঁজ আরেকটা বাড়ল ওর কপালে। 'তাতে কি?'

'আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে কতটুকু জানেন আপনি?'

মাথা দোলাল রানা। বুঝতে পারছে না আলোচনা কোনদিকে গড়াচ্ছে 'প্রায়

কিছুই জানি না। ভদ্রলোক আমেরিকার প্রথম সারির ধনীদের একজন ছিলেন. '৬৪ সালে ম্যানহাটনে নিজের বাসার সামনে নিহত হন, এই পর্যন্তই। কেন?'

'ভুল,' মৃদু কণ্ঠে বলল মেয়েটি

'ভুল! কি, কোনটা?'

'পরেরটা। '৬৪ সালে মারা যায়নি আর্থার স্যান্ডলার।'

'বুঝলাম না।' হতভম্ব চেহারা হলো রানার।

'সবাই যা জানে, পত্রিকায় তার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তা সত্যি নয় '৭৬ সালেও আর্থারকে দেখা গেছে বহাল তবিয়তে।'

হেলান দিয়ে বসল রানা। তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে চাউনি। দু'হাত বুকে বেঁধে চেয়ে আছে মেয়েটির দিকে। 'আপনি তা জানেন কি করে?'

'সে এক লম্বা কাহিনী।'

'হতেই হবে,' ওপর-নিচে মাথা দোলাল ও 'তাতে কোন সন্দেহ নেই আমার।'

'শুনতে চান সে কাহিনী?'

'অনুমান করি ওটা শোনাবার জন্যেই এখানে পায়ের ধুলো দিয়েছেন আপনি '

হাসির ভঙ্গি করল যুবতী। 'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

''তাহলে বোধহয় তাড়াতাড়ি বলে ফেলাই ভাল ' সিগারেট প্যাকেটের দিকে হাত বাড়াতে গিয়েও থেমে গেল রানা।

'গো অ্যাহেড,' ব্যাপারটা লক্ষ করে মাথা ঝাঁকাল মেয়েটি। 'কোন অসুবিধে নেই '

'ধন্যবাদ কফি?' মেয়েটি কে হতে পারে ভেবে পাচ্ছে না রানা, তবে তার আগমনের কারণ খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছে বলে মনে হলো।

'হ্যাঁ, প্লীজ!'

ইন্টারকমে দু'কাপ কফি পাঠাতে বলে সিগারেট ধরাল রানা। 'এবার বলুন আপনার কাহিনী, শুনি। তার আগে একটা প্রশ্ন, এসব আমাকেই কেন শোনাতে হবে ভাবলেন আপনি?'

'আমি ভাবিনি। ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর আপনার সঙ্গে আমাকে দেখা করার নির্দেশ দিয়ে গেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস।'

'আই···সী!' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল মাসুদ রানা। কি যেন ভাবল একটু আনমনা

কফি এল নীরবে যার যার কাপে চুমুক দিল ওরা।

'শুরু করতে পারি?' বলল মেয়েটি

'হ্যাঁ, নিশ্চই!'

'১৯৬৪ সালে আর্থারের হত্যাকাণ্ডের খবরটা ছিল একটা ডাহা মিথ্যে। মানে আমি বলতে চাইছি, হত্যাকাণ্ড একটা ঘটেছিল ঠিকই। দিন এবং স্থানের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।'

'তাহলে সন্দেহটা কোথায়?'

'নিহত ব্যক্তিটির ব্যাপারে। সে আর যে-ই হোক, আর্থার ছিল না। আমি নিশ্চিত জানি। ১৯৭৬ সালে তাকে স্বচক্ষে দেখেছি আমি।'

'ভদ্রলোককে আপনি ভালই চেনেন মনে হয়!' ধাঁধায় পড়ে গেল রানা। ঘর পোড়ার মধ্যে আলু পোড়াতে এসেছে কি না এ মেয়ে কে জানে!

অদ্ভুত এক হাসি ফুটল যুবতীর সুন্দর মুখে। 'হ্যাঁ। শুধু ভাল নয়, খুব ভাল চিনি। আমি তার মেয়ে।'

চমকে উঠল মাসুদ রানা। 'কি বললেন!'

'অবাক হবেন না। ঘটনা সত্যি। আর্থার স্যান্ডলার আমার জন্মদাতা।'

'কিন্তু...'

'এর মধ্যে কোন কিন্তু নেই, মিস্টার রানা। ১৯৫৯ সালের অক্টোবরে আমার মাকে বিয়ে করে আর্থার স্যান্ডলার। ১৯৬০ সালের আগস্টে আমার জন্ম। মার সঙ্গে আর্থারের পরিচয় হয় যুদ্ধের সময়। মার বয়স তখন সবে চোদ্দ। দু'জনের বয়সের বেশ ব্যবধান ছিল, এবং অনেক দেরিতে বিয়ে হয়েছিল ওঁদের।'

'কোন যুদ্ধের কথা বলছেন আপনি?'

'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।'

'আমার জানামতে আর্থার স্যান্ডলার বিয়ে করেননি। ১৯৬৪ সালে যখন নিহত হন তিনি, তখনই আইনগত ফয়সালা হয় যে তাঁর কোন সন্তান বৈধ বা অবৈধ, কোনটিই নেই। যে কারণে ভিক্টোরিয়া স্যাণ্ডলার তাঁর যাবতীয় সম্পত্তির....'

'উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি লাভ করেন,' মাসুদ রানার বক্তব্য শেষ করল মেয়েটি টেবিলের ওপর রাখা ব্যাগটা খুলল সে। একটা কাগজ বের করে এগিয়ে দিল ওর দিকে

'কি এটা?'

'আমার বার্থ সার্টিফিকেট ১৯৬০ সালের ১৬ আগস্ট ইংল্যাণ্ডের এক্সিটারে জন্ম আমার। চেক করে দেখুন। ওঁদের বিয়ের ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছিল।'

'এতই গোপন যে এত বছরেও কেউ তা জানতে পারেনি?' কাগজটায় চোখ বোলাতে লাগল মাসুদ রানা। এ জিনিস জাল নয়, দেখেই বুঝল ও, নিঃসন্দেহে খাঁটি।

'ঠিক, এতই গোপন।'

'কিন্তু মিস···ইয়ে, নাকি মিসেস···?'

'বিয়ে হয়নি আমার। আমার নাম ম্যাকঅ্যাডাম। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম।'

'ম্যাকঅ্যাডাম? স্যান্ডলার নয়?'

'এখনও নয়। তবে হতে এসেছি।'

'স্যান্ডলার পরিবারের উত্তরাধিকারী···'

'হ্যাঁ। সে দাবি নিয়ে শিগ্গিরই কোর্টে যাব আমি।'

'কিসের ভিত্তিতে দাবি জানাবেন?'

'যে সব ডকুমেন্টস আপনার জিম্মায় রেখে গেছেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস, সে সবের ভিত্তিতে। ওর সঙ্গে আপনাকে লেখা তাঁর একটা চিঠি

ছিল, সেটা পড়েছেন নিশ্চই? ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর খামটা খোলার কথা ছিল আপনার।'

এই সেরেছে! ভেতরে ভেতরে আস্ত একটা ডিগবাজি খেয়ে উঠল মাসুদ রানা। সর্বনাশ! এখন কি হবে? উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল ও 'কিন্তু ওতে যে-কেউ এসে দাবি করলেই ডকুমেন্টসগুলো তাকে দিয়ে দেয়ার কোন নির্দেশ নেই। এনি ওয়ে, তখন বললেন ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর আমার সঙ্গে আপনাকে দেখা করতে বলেছেন ড্যানিয়েলস, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কি ভাবে খবরটা আপনাকে জানিয়েছিলেন ভদ্রলোক? চিঠির মাধ্যমে?'

মাথা দোলাল লেসলি। 'না। টেলিফোনে।'

'আই সী!'

'আমি যে-কেউ নই, মিস্টার মাসুদ রানা। আমি আর্থার স্যান্ডলারের সন্তান।'

'জানি। শুনেছি। কিন্তু আগে সেটা আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আমার কাছে। কোর্ট তো পরের কথা। এই বার্থ সার্টিফিকেট জাল করা কঠিন কিছু নয়, আপনিও তা জানেন। হরহামেশা জাল হচ্ছে এসব। তার মানে আমি বলছি না যে এটা আসলেই ভুয়া।'

সুবোধ মেয়ের মত মাথা দোলাল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'আমি বুঝেছি

'আপনাকে সত্যিকার অর্থে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম প্রমাণ করতে হবে কাদের সন্তান আপনি। আরও প্রমাণ করতে হবে আর্থার স্যান্ডলারের সঙ্গে আপনার মার বিয়ে হয়েছিল। এ ধরনের এক-আধটা সার্টিফিকেট দেখিয়ে কোর্ট দূরে থাক, আমাকেও প্রভাবিত করতে পারবেন না আপনি।'

'জানি।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। পর্যবেক্ষণ করছে মেয়েটিকে। ব্যাগ থেকে ফিতে বাঁধা এক গাদা চিঠি বের করল সে এবার। বাঁধন খুলে সেগুলো ঠেলে দিল সামনে।

'এগুলো দেখুন। মাকে লেখা আর্থার স্যান্ডলারের চিঠি।'

একটা বিষয় খেয়াল করল মাসুদ রানা, মাকে ঠিকই মা বলছে মেয়েটি, অথচ বাবার বেলায় জন্মদাতা আর্থার স্যান্ডলার অথবা আর্থার ইত্যাদি বলে চালাচ্ছে তা-ও বেশ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে। কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করল ও

'আমার মার সঙ্গে আর্থার স্যাণ্ডলারের পরিচয় হয় যুদ্ধের শেষভাগে, ১৯৪৪ সালে। তখন থেকে শুরু করে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বেশ কিছু চিঠি লিখেছে সে মাকে। সব এখানে নেই অবশ্য। কয়েকটা নমুনা নিয়ে এসেছি কেবল। প্রয়োজনে বাকিগুলোও দেখানো যাবে। যদি ইচ্ছে করেন আপনার পছন্দের এক্সপার্ট দিয়ে ওগুলোর হাতের লেখা ভেরিফাই করিয়ে নিতে পারেন। তবে কোন অবস্থাতেই চিঠিগুলো হস্তান্তর করব না আমি। আমার কাছেই থাকবে ওগুলো।'

চোখ নামিয়ে স্তূপটার দিকে তাকাল মাসুদ রানা কোন মন্তব্য করল না। ভেতরে একটু একটু করে আগ্রহ বাড়ছে, টের পাচ্ছে রানা। হাত বাড়িয়ে

চিঠিগুলো কাছে টেনে নিল। খামগুলো আসল রং হারিয়ে বাদামী হয়ে গেছে দেখলেই বোঝা যায় বেশ পুরানো। বিশেষ করে স্ট্যাম্পের ওপরকার পোস্টমার্কগুলো তীক্ষ্ণ চোখে পরখ করল ও। আসলের মতই দেখাচ্ছে মনের বিস্ময় মনেই চেপে রাখল রানা।

'আরও একটা জিনিস আছে।' ব্যাগের ভেতর থেকে কালো চামড়ার মলাট বাঁধানো মোটা একটা বই বের করল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। তার প্রতিটি পাতার কিনারা সোনালী রং করা দেখা মাত্রই অনুমান করল রানা ওটা কি। মলাটে বড় সোনালী হরফে HOLY BIBLE লেখা।

'ওটা খুলুন,' বলল মেয়েটি। 'সামনের কভারের ভেতর দিকটা দেখুন

চিঠিগুলো এপাশে ঠেলে দিল মাসুদ রানা। বাইবেলটা খুলল সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল ওর। কোন কারণ নেই, তবু কেন যেন শীত শীত লেগে উঠল। ওর ফ্রন্ট কভারের সঙ্গে বাঁধানো আছে একটা ম্যারেজ সার্টিফিকেট নোটারাইজড। বিয়ের তারিখটা লক্ষ করল মাসুদ রানা। অক্টোবর ২০, ১৯৫৯। বর আর্থার স্যান্ডলার, ঠিকানা নিউ ইয়র্ক। কনে এলিজাবেথ অ্যান চ্যাটসওয়ার্থ, ঠিকানা টিভারটন, এক্সিটার।

উত্তর ফেনউইকের ডেভন টাউনশিপের সেন্ট জর্জে'স চ্যাপেলে এ বিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বিয়ের দু'জন সাক্ষীর সই আছে সার্টিফিকেটে। তৃতীয় সইটা রয়েছে একদম নিচে, ডানদিকে। করেছেন জোনাথন ফিলিপ মূর, ডি. ডি। সেন্ট জর্জে'স চ্যাপেলের প্যাসটর পুরো দু'মিনিট ব্যয় করল রানা সার্টিফিকেটটার পিছনে তারপর চোখ বোলাল বাইবেলের টাইটেল পেজে রোমান হরফের ঝকঝকে ছাপা বলছে ANNO DOMINI MCMXLII. প্রিন্টেড ইন গ্রেট ব্রিটেন, ১৯৫৮।

'আর কিছু আছে?' চোখ তুলল রানা।

'আপনি নিশ্চই ভাবছেন এত বছর কোথায় ছিলাম আমি? এখন কোত্থেকে এসে হাজির হলাম, তাই না?'

'তা বলতে পারেন।'

কাঁধ পর্যন্ত দীর্ঘ বাদামী চুলগুলো দুই কানের পিছনে গুঁজল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। তারপর রানা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ব্লাউজের কলার ও তার নিচের বোতামটা খুলে ফেলল টপাটপ স্কার্ফের নট খুলল সে, আলতো টানে গলা থেকে নামিয়ে আনল ওটা। চমৎকার গড়নের ফর্সা গলাসহ বুকের ওপরের অংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়ল লেসলির।

'এবার দেখুন, মিস্টার রানা,' গলা উঁচু করল মেয়েটি 'ভাল করে দেখুন। আরেকটু ঝুঁকে, প্লীজ!'

চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। টেবিলের প্রান্তে বুক বাধিয়ে উবু হয়ে তাকাল মেয়েটির গলার দিকে। গলার ঠিক মাঝখানে সূক্ষ্ম একটা দাগ দেখা গেল। কাটার দাগ, পুরো গলা ঘিরে আছে ওটা লেসলির। ধপধপে সাদা চামড়ার ওপর বেখাপপা লাগছে ফ্যাকাসে লাল দাগটা।

'কিসের দাগ ওটা?'

'পিয়ানোর তার, মিস্টার রানা।' ঠিকঠাক হয়ে নিল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম

'বুঝলাম না

'কন্যাকে দেয়া আর্থার স্যান্ডলারের উপহার এটা! ১৯৬৯ সালের শেষ দিকে, আমার বয়স যখন নয়, তখন এই উপহারটা দিয়েছিল সে আমাকে। কল্পনা করুন, নয় বছরের একটি শিশুকে তারই জন্মদাতা গলায় পিয়ানোর তার পেঁচিয়ে হত্যা করতে উদ্যত। একটু কল্পনা করুন শিশুটির তখনকার মানসিক অবস্থা।'

চুপ করে চেয়ে আছে রানা মেয়েটির দিকে। মুখে কথা নেই। কল্পনা করছে পূর্ণ বয়স্ক এক পুরুষের হাতের প্রচণ্ড টানে একটু একটু করে শিশুটির গলার নরম মাংসের মধ্যে দেবে যাচ্ছে ক্ষুরধার পিয়ানোর তার, ছটফট করছে সে বিস্ফারিত চোখে, অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে খুনীর দিকে। নীরবে কেটে গেল কিছু সময়।

লেসলি বলে উঠল হঠাৎ, 'আপনার রুমে আমি আরসনের গন্ধ পাচ্ছি!'

'কি বললেন?'

'আগুন লেগেছিল আপনার অফিসে?'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা।

'জানি।' আপনমনে মাথা দোলাল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম 'যেখানেই আর্থার স্যান্ডলার, সেখানেই ধ্বংসের গন্ধ পাওয়া যায়।'

'অর্থাৎ?'

ড্যানিয়েলসের রেখে যাওয়া ডকুমেন্টসগুলোর জন্যেই আগুন আপনাকে খুঁজে নিয়েছে, মিস্টার রানা। আমি নিশ্চিত জানি।'

'দেখুন, মিস্...'

'আমাকে লেসলি ডাকবেন।'

'ধন্যবাদ আপনাকেও তাহলে আমার নামের আগে "মিস্টার" বাদ দিতে হবে।'

অদ্ভুত সুন্দর হাসি ফুটল মেয়েটির মুখে 'ডান।' সামান্য বিরতি দিয়ে আবার মুখ খুলল লেসলি। 'আমি উচ্চ শিক্ষিত, প্রায় পণ্ডিত বলা চলে আমাকে এবং ভাল আর্টিস্টও বটে তারপরও আমার দেহে রয়েছে ভয়ঙ্কর এক ক্রিমিনালের রক্ত, মাসুদ রানা। কেন কি হয় আন্দাজ করে নেয়ার অদ্ভুত এক ক্ষমতা আছে আমার। ওটা আছে বলেই আজও দম নেই আমি চোখ মেলে দেখতে পাই সুন্দর এই গ্রহটিকে। নইলে সেই নয় বছর বয়সেই মৃত্যু হতো আমার। আপনি লক্ষ করেছেন নিশ্চই, আমি বলেছি ১৯৬৯ সালে আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিল আর্থার স্যান্ডলার?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা

'অথচ সবাই, আপনিও জানেন ১৯৬৪ সালে খুন হয়েছে সে

'এখনও তাই জেনে বসে আছি আমি, লেসলি। যতক্ষণ না আপনি প্রমাণ করতে পারছেন আপনার কথা সঠিক '

'সে জন্যে খানিকটা সময় ব্যয় করতে হবে আপনাকে। আমার লম্বা কাহিনীটা শুনতে হবে একদম প্রথম থেকে শুনতে হবে সব।'

'আমি প্রস্তুত। আপনি শুরু করতে পারেন '

'বেশ।' সশব্দে দম ছাড়ল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। মুখ নামিয়ে কিছু সময় দুই হাতের তালু পরীক্ষা করল। কথা গোছাচ্ছে 'আর্থার স্যান্ডলার ছিল এক পেশাদার স্পাই।'

'কি?' বিস্মিত হলো রানা।

'স্পাই। গুপ্তচর। তবে পুব না পশ্চিম, কোন ব্লকের কোন দেশের হয়ে কাজ করত বলতে পারব না।'

'আর্থার স্যান্ডলার গুপ্তচর ছিলেন?' দ্রুত স্মৃতির পাতা ওল্টাতে লাগল মাসুদ রানা। কিন্তু এ লাইনে এমন কোন নাম মনে পড়ল না।

'হ্যাঁ।'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'মার মুখে তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে ছাড়া ছাড়া যেটুকু শুনেছি, তার সাথে নিজের কল্পনা শক্তি মিলিয়ে অনুমান করে নিয়েছি।'

'বুঝলাম।'

'আমার মা খুব ভাল মানুষ ছিলেন। খুব সহজ-সরল গ্রাম্য মেয়ে। লেখাপড়া খুব একটা জানতেন না। যাকে ভালবাসতেন, তার জন্যে প্রাণ দিতে পারতেন, এমন এক মহিলা ছিলেন তিনি। আর তাঁর স্বামী?' করুণ হাসি ফুটল লেসলির মুখে 'প্রাণ কেড়ে নিতে ওস্তাদ ছিল সে, কসাই ছিল আস্ত একটা! আমার মার মত একটা মেয়েকে ত্যাগ করেছিল মানুষটা, ভাবতেও অবাক লাগে অথচ এই মানুষটির সাথে মার পরিচয় হয় ১৯৪৪ সালে। পরিচয় থেকে প্রেম। তারপর তাকে পাওয়ার আশায় দীর্ঘ পনেরোটি বছর অপেক্ষা করেছে আমার দুঃখিনী মা।

'যুদ্ধের সেই সময়টায় এক্সিটারে প্রচুর দেশী-বিদেশী সৈন্য ছিল। ব্রিটিশ, মার্কিন, ক্যানাডিয়ান, ফরাসী ইত্যাদি ছাড়া আরও কয়েক দেশের সৈন্য ছিল আর ছিল নানা দেশের স্পাই। ইউনিফর্মধারী ট্রুপস্ আর সাদা পোশাকের স্পাইয়ে গিজগিজ করত তখন এক্সিটার।' অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম অতীতে হারিয়ে গেছে।

১৯৪৪। এক্সিটারের এক রেস্তোরাঁ মালিকের অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে, এলিজাবেথ অ্যান চ্যাটসওয়ার্থ। মেয়েটি এতিম। জার্মান বিমান হামলায় বছর দু'য়েক আগে বাবা-মা এবং ছোট এক ভাই, সবাইকে হারিয়েছে চোদ্দ বছর বয়স তার বাধ্য হয়ে নিজেকেই রেস্তোরাঁ চালাতে হয় তার এখানে সাধারণত সৈনিকরাই আসে। সাদা পোশাকের কিছু কিছু বিদেশীও আসে। তাদের পরিচয় জানে না এলিজাবেথ, জানার উপায়ও নেই। তবে অনুমান করতে পারে সে সাদা পোশাকের দলে আছে এক যুবক, আমেরিকান। যুবক দীর্ঘদেহী, চমৎকার চেহারা। ছয় মাস নয় মাস পর হঠাৎ একদিন উদয় হয়, কয়েকদিন থাকে এক্সিটারে, তারপর আবার একদিন গায়েব হয়ে যায় হঠাৎ করে। কোন খবর থাকে না দীর্ঘ দিন পর্যন্ত। খেয়াল করেছে অ্যান, সব সময় একাই রেস্তোরাঁয় আসে যুবক, এবং একাই বেরিয়ে যায় কারও সঙ্গে কথা বলে না। যতক্ষণ থাকে, একাই একটা টেবিল দখল করে বসে থাকে দোকান বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত বসেই থাকে যুবক, ক্যানের পর ক্যান বীয়ার পান করে আর সারাক্ষণ গভীর চিন্তায়

ডুবে থাকে।

একে প্রথম ওদের ইনে দেখে অ্যান দু'বছর আগে, ১৯৪২ সালে। তখন সে ছোট ছিল, তাই বিশেষ কোন দৃষ্টিতে দেখেনি যুবককে। সে-ও লক্ষ করেনি মেয়েটিকে। কিন্তু দুই-আড়াই বছরে গায়ে-গতরে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে অ্যান, তেমনি বেড়েছে চেহারার জৌলুস। ও বুঝতে পারে, যুবকটিও ওর মত নিঃসঙ্গ। ঘন ঘন চার চোখের মিলন হতে থাকে ওদের এই সময়। তারপর একটু হাসি, একটা দুটো কথা। পরিচিত হলো ওরা পরস্পরের সাথে। জানা গেল যুবকের নাম আর্থার স্যান্ডলার।

১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা। ইউরোপের যুদ্ধের পরিণতি প্রায় নিশ্চিত, এমন সময়, প্রায় তিন মাস পর আচমকা এক্সিটারে এসে উপস্থিত স্যান্ডলার। রাত একটায় দোকান বন্ধ করে বাসায় যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলো এলিজাবেথ। স্যান্ডলার জানতে চাইল সে তাকে তার বাসায় পৌঁছে দিতে যেতে পারে কি না? খুশি মনে রাজি হলো এলিজাবেথ। দোকানের কাছেই তার বাসা, চার ব্লক দূরে। এলিজাবেথের মনে হলো দেখতে দেখতে ফুরিয়ে গেল পথ। ভদ্রতা করে যুবককে বাসায় আমন্ত্রণ জানাল সে। রাতটা তার আশ্রয়ে থেকে গেল আর্থার স্যান্ডলার।

এক যুবক আর এক কিশোরী, দু'জন সম্পূর্ণ দুই জগতের বাসিন্দা, অথচ বিশ্বের রাজনীতি এক করে দিল ওদের। পরস্পরের প্রেমে হাবুডুবু খেতে লাগল আর্থার ও অ্যান। একে অন্যের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্যে উন্মাদ-প্রায় হয়ে উঠল। এক সঙ্গে কাটাতে লাগল দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। এলিজাবেথ লক্ষ করল, তাকে নিয়ে যুবকের কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে কি না জানতে চাইলেই গম্ভীর হয়ে যায় আর্থার। আচমকা গভীর চিন্তার আবর্তে ডুবে যায় যেন

কেন অমন হয়ে যায় যুবক, বুঝতে পারে না এলিজাবেথ। এক সময় ওই জাতীয় প্রশ্ন করা বন্ধ করে দেয় সে। যে ভাবে চলছে চলুক, ভাবে সে। ক্ষতি কি? সেবার পুরো এক মাস এক্সিটারে কাটায় আর্থার স্যান্ডলার। দিনগুলো যেন স্বপ্নের ঘোরে কেটে যায় ওদের দু'জনের। দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায় দীর্ঘ একটা মাস। এরপর একদিন এলিজাবেথের কাছ থেকে বিদায় নেয় আর্থার। কথা দিয়ে যায় আবার আসবে সে। তবে কখন তা বলা সম্ভব নয়। সে নিজেই জানে না তা। চলে গেল আর্থার স্যান্ডলার।

দিন কাটে এক এক করে। কিন্তু এলিজাবেথের সময় কাটে না। কিছুই তার ভাল লাগে না। যন্ত্রের মত কাজ করে যায় কেবল। এক একটা দিন যায় আর ক্যালেণ্ডারের পাতায় দাগ কাটে সে। আশার বাতি ক্রমেই নিবু নিবু হয়ে আসে। রেডিওর খবর একটাও মিস করে না সে। মন দিয়ে শোনে সমস্ত সেন্সরড খবর রাতে ক্লান্ত দেহ বিছানায় এলিয়ে দিয়ে নিঃসাড় পড়ে থাকে অ্যান, ঘুম আসে না এক এক করে পাঁচ মাস কেটে যায় এমনি করে।

তারপর একদিন, এক বর্ষণমুখর রাতে, চোখ তুলতেই ভীষণরকম চমকে উঠল এলিজাবেথ দোকানের ভেতর, দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে আর্থার স্যান্ডলার। ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে মিটিমিটি অন্তর থেকে বুক ঠেলে উঠে

আসা আনন্দ-চিৎকারটা ঠেকানোর কোন চেষ্টাই করল না এলিজাবেথ. হাতে ধরা দামী কফি সেট সাজানো ট্রে-টা খসে গেল। পাগলের মত ছুটে গিয়ে আর্থারের প্রশস্ত বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটি।

সেবার তিন সপ্তাহ এক্সিটারে ছিল স্যান্ডলার। রাত কাটাত এলিজাবেথের উষ্ণ আলিঙ্গনে। ভোর হলেই উধাও হয়ে যেত কোথায় যেন। সারাদিনে তার দেখা মিলত না। তারপর একদিন চলে গেল সে আবার আসবে বলে এভাবেই চলল দুই বছর। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে কবেই, অথচ আর্থার স্যান্ডলারের ব্যস্ততা কমে না। কেবলই যায় আর আসে সে. কেবলই যায় আর আসে।

একদিন আর নিজেকে সামাল দিতে পারল না এলিজাবেথ; ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করেই বসল, 'এই যে ঘন ঘন গায়েব হয়ে যাও তুমি, কোথায় যাও?' যদিও প্রশ্ন করার আগেই বুঝে নিয়েছে সে উত্তর পাওয়া যাবে না।

কিন্তু আশ্চর্য! এলিজাবেথকে চমকে দিয়ে বলে উঠল আর্থার, 'অস্ট্রিয়া।'

তার মুখের দিকে বেকুবের মত চেয়ে থাকল মেয়েটি। বুঝতে পেরেছে, সত্যি কথাই বলেছে তার আমেরিকান প্রেমিক। সন্দেহ আগেই করেছিল, উত্তরটা শুনে তা আরও দৃঢ় হলো। তার প্রেমিক একজন স্পাই, বুঝে ফেলল এলিজাবেথ। কিন্তু এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করল না।

'তুমি বিয়ে করেছ?'

'না,' মাথা দোলাল আর্থার। 'তোমাকেই বিয়ে করব ঠিক করেছি।' পরক্ষণেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সে। নিচু কণ্ঠে বিড় বিড় করে বলল, 'কিন্তু আমার প্রাণের কোন নিরাপত্তা নেই, অ্যান।'

সজোরে আর্থারকে আঁকড়ে ধরল এলিজাবেথ। চোখ দিয়ে পানি পড়ছে দরদর করে। এমনি অনিশ্চয়তার মধ্যে কেটে গেল আরও কিছুদিন। তারপর ১৯৪৭ সালে সেই যে গেল স্যান্ডলার, পুরো চার বছর কোন খবর নেই; প্রতীক্ষা করতে করতে পাগল হওয়ার দশা এলিজাবেথের। দুই-চার মাস পর পর এক-আধটা চিঠি আসে স্যান্ডলারের। প্রতিটিতেই থাকে 'খুব শীঘ্রি' আসছি ধরনের আশ্বাস বাণী। অতঃপর ১৯৫১ সালে এল আর্থার।

এলিজাবেথ জানতে চাইল, কেন এত দেরি হলো তার ফিরতে। প্রথমে কিছু জানাতে অস্বীকার করল স্যান্ডলার। পরে অবশ্য বলেছে। 'ভয়ঙ্কর এক বিপদে জড়িয়ে পড়েছি আমি, অ্যান,' তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বলল আর্থার। 'সাজ্ঘাতিক এক বিপদে পড়েছি। এ থেকে কোনদিন বেরুতে পারব কি না জানি না।'

পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা ঘরের মাঝে। মুখ ফিরিয়ে রেখেছে আর্থার, যাতে তার চোখের পানি দেখতে না পায় এলিজাবেথ এলিজাবেথ টের পেল ঠিকই, তবে তা বুঝতে দিল না আর্থারকে।

সেবার বিদায়ের দিন আর্থার আদর করে বুকে টেনে নিল প্রেমিকাকে বলল, 'যদি ভাগ্য ভাল হয়, বিপদ থেকে উদ্ধার পাই, তাহলে আবার আমাদের দেখা হবে। বিয়ে করে আমেরিকায় নিয়ে যাব আমি তোমাকে।'

ফের চলে গেল আর্থার স্যান্ডলার। এলিজাবেথের কাছে মাঝে মধ্যে চিঠি পাঠাত। তার প্রতিটিতে থাকত, 'আর কয়েক দিনের মধ্যেই আসব', 'খুব তাড়াতাড়ি আসছি' ধরনের পুরানো আশ্বাস। তার আসার আশায় থেকে থেকে চোখে ছানি পড়ে যাওয়ার দশা এলিজাবেথের। অবশেষে এল সে। প্রায় নয় বছর পর। ১৯৫৯ সালের ১৯ অক্টোবর গভীর রাতে। পরদিন ২০ অক্টোবর, এলিজাবেথকে নিয়ে উত্তর ফেনউইকের এক চার্চইয়ার্ডে গেল সে। বিয়ে হলো ওদের সেখানে। আঠারো দিন পর নববধূকে রেখে শেষবারের মত এক্সিটার ত্যাগ করল আর্থার স্যাণ্ডলার আবার উধাও হয়ে গেল। মাসের পর মাস কাটে, কোন খবর নেই তার। দশ মাস পর এক মেয়ের জন্ম দেয় এলিজাবেথ। নাম রাখে তার লেসলি। লেসলি স্যান্ডলার।

আশায় বুক বেঁধে অপেক্ষায় থাকে এলিজাবেথ। বছরের পর বছর কাটে, কোন খবর আসে না আর্থারের। যোগাযোগ করে না সে, চিঠি লেখে না, টেলিফোন করে না। নিজেও আসার নাম করে না।

'তাঁকে ট্রেস করার চেষ্টা করেননি আপনার মা?' মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'নিশ্চই!' বলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'কিন্তু দুই দুর্ভেদ্য দেয়াল পথ রোধ করে দাঁড়ায় তাঁর। একটা ব্রিটিশ দেয়াল, অন্যটা আমেরিকান। আর্থারকে খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে ব্রিটিশ ফরেন অফিসের অনেকের যা-তা মন্তব্য শুনতে হয়েছে আমার মাকে। অনেক নোংরা কথা হজম করতে হয়েছে। কিন্তু মা নাছোড়বান্দা। দিনের পর দিন ধরনা দিতে লাগলেন সেখানে। শেষে হয়তো বোধোদয় হলো ফরেন অফিসের, বুঝল ওরা, মহিলা সহজে ফিরে যাবে না।

'একদিন বড় কর্তার রুমে ডাকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ধমক-ধামক মারা হলো মাকে। জানিয়ে দেয়া হলো আর্থার স্যান্ডলার নামে কোন আমেরিকানের অস্তিত্ব নেই ব্রিটেনে। ছিলও না কোনদিন। এ নিয়ে আবার সেখানে দেন-দরবার করার চেষ্টা করা হলে সোজা ঘাড় ধরে জেলে পুরে দেয়া হবে মাকে। হতাশ হয়ে ফিরে এলেন তিনি। এবার চেষ্টা করলেন লণ্ডনের আমেরিকান এম্বাসি ও ইউএস আর্মি হেডকোয়ার্টার্সের বড় কর্তাদের ধরে কিছু একটা বিহিত করতে। কিন্তু সেখানেও হলো না কিছু।'

'ওদের আর্থার স্যান্ডলারের সাথে তাঁর বিয়ের সার্টিফিকেটটা দেখাননি তিনি?'

'হ্যাঁ, দেখিয়েছেন। লাভ হয়নি। ওরা বরং ওটা দেখে আরও বেশি দুর্ব্যবহার করেছে মার সঙ্গে। মাকে জানানো হয় এ নামে কোন মানুষ সারা আমেরিকাতেই নাকি নেই। তাঁর মত এক সস্তা বারমেইড যদি আমেরিকান এক মিলিয়নেয়ারকে বিয়ে করার অলীক স্বপ্নের কথা ছড়িয়ে বেড়ায় এভাবে যেখানে-সেখানে, তারা বাধ্য হবে তাঁকে পুলিসে অথবা লণ্ডনের কোন মেন্টাল হাসপাতালের হাতে তুলে দিতে

'তারপর যা হওয়ার তাই হলো। আর্থার স্যান্ডলারের আশা ছেড়ে দিলেন আমার মা। হয়তো তার মৃত্যু হয়েছে, যে আশঙ্কা সে নিজের মুখেই প্রকাশ করেছিল একদিন, এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন মা। আমাকে নিজের মত করে বড় করার কাজে মন দিলেন পুরোপুরি। বাসায় আমি, আর

বাইরে ব্যবসা, এর মধ্যে নিজেকে পুরোপুরি গুটিয়ে নিলেন তিনি।'

'আর বিয়ে করেননি?'

'না। করেননি।'

উঠে ঘরের আলো জ্বেলে দিল মাসুদ রানা। সন্ধে হয়ে আসছে ফিরে এসে আসনে বসতে বসতে বলল, 'কফি দিতে বলি?'

'হ্যাঁ, প্লীজ! গলা শুকিয়ে গেছে।'

পাঁচ মিনিট পর আবার শুরু করল লেসলি ম্যাকস্যাডাম। 'আমার বয়স চার বছর পুরো হওয়ার আগেই নিউ ইয়র্কে সো-কলড মৃত্যু হলো আর্থার স্যান্ডলারের। ১৯৬৪ সালের এক সকালে, বাসা থেকে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় তিন অস্ত্রধারী গুলি করে ঝাঁঝরা বানিয়ে দিল তার বুক। আর্থারের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারও ছিল। ঘটনার আকস্মিকতায় হতচকিত হয়ে গেল সে, তারপরই চিৎকার করে আছড়ে পড়ল জ্ঞান হারিয়ে। তার হাতে ধরা একটা শপিং ব্যাগে ছিল কয়েক হাজার ডলার, সব কড়কড়ে এক ডলারের নোট। রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল টাকাগুলো। কিন্তু সেদিকে তাকালও না হত্যাকারীরা, কাজ সেরেই অপেক্ষমাণ একটা গাড়িতে উঠে চলে গেল তারা।

'এত বড় এক ধনী আমেরিকানের হত্যাকাণ্ড ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায়ও ভালই কভারেজ পেল। সবাই গুরুত্ব দিয়ে ছাপাল খবরটা মার চোখেও পড়ল সে খবর। নিহতের ছবি দেখেই চিনলেন মা আর্থার স্যান্ডলারকে অবাক হয়ে ভাবলেন, বেঁচে ছিল, তবুও কেন সে আসেনি তাঁর কাছে? কেন যোগাযোগ করেনি?'

'তারপর?'

'তারপর ডজনখানেক সলিসিটারের সঙ্গে দেখা করলেন মা। বিয়ের দলিল, আর্থারের লেখা চিঠিপত্র ইত্যাদির সাহায্যে তার স্ত্রী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কিন্তু সবাই হাঁকিয়ে দিল তাঁকে ভুয়া দাবিদার অপবাদ দিয়ে। ফরচুন হান্টার বলে। তাদের কাছে ব্যর্থ হয়ে স্থানীয় এক পিটিশনারের কাছে গেলেন মা। লোকটা আশ্বাস দিল তার পক্ষে যতদূর সম্ভব করবে সে কিন্তু করেনি লোকটা। অথবা হয়তো করতে পারেনি শেষে আবার মার্কিন কনস্যুলেটে যোগাযোগ করলেন আমার মা। ওরা কয়েকদিন ধরে 'ইনভেস্টিগেশন' চালাল তারপর জানিয়ে দিল তাঁর বিয়ের দলিল ইত্যাদি সব জাল। মাকে জালিয়াত বলতেও কসুর করল না ওরা। এই করতে করতে পাঁচ বছর চলে গেল দুয়ারে দুয়ারে ধরনা দিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন মা।

'শেষে আর মাত্র একটাই অস্ত্র ছিল তাঁর, উপায় না পেয়ে তাই ছুঁড়লেন তিনি। পর পর কয়েকটা চিঠি ছাড়লেন স্যান্ডলারদের নিউ ইয়র্কের ঠিকানায়।'

'কোন জবাব এসেছিল?'

করুণ হাসি ফুটল লেসলির ঠোঁটের কোণে। 'হ্যাঁ,' আনমনে বলল সে 'তবে ডাকে নয়। সশরীরে।'

টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসল মাসুদ রানা। 'তার মানে?'

'হাতে হাতে জবাবটা নিয়ে এসেছিল আর্থার স্যান্ডলার

'কি বললেন!'

'হ্যাঁ, আর্থার স্যান্ডলার স্বয়ং।'

চুপ করে থাকল রানা। অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে দেখছে মেয়েটিকে।

'অবাক হলেন? আমি তো বলেইছি, ১৯৬৪ সালে আর যে-ই হোক, আর্থার স্যান্ডলার নিহত হয়নি। আর্থারকে শেষবার দেখেছি আমি ১৯৭৬ সালে। সবচে' মজা কি জানেন? জীবনে মাত্র দু'বারই দেখেছি আমি আমার জন্মদাতাকে প্রথমবার ১৯৬৯ সালে এক্সিটারে, এবং দ্বিতীয়বার ১৯৭৬ সালে, সুইটজারল্যান্ডে আর প্রথম যেদিন দেখলাম মানুষটিকে, সেদিনই লেসলি স্যান্ডলার মরে গেল কিছুদিন পর আবার জন্ম নিল সে, তবে স্যান্ডলার নয়, ম্যাকঅ্যাডাম হয়ে।'

তাকিয়েই থাকল মাসুদ রানা। ভুল দেখল কি না বলতে পারবে না, মনে হলো কাঁদছে মেয়েটি। দু'চোখ চিক চিক করছে লেসলির।

## চার

নীরবে কেটে গেল কয়েক মিনিট। মুখ তুলছে না লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। চুপ করে বসে আছে মাসুদ রানা। অস্বস্তি বোধ করছে। ভাবছে, যদি পাকা অভিনেত্রী হয়ে না থাকে এ মেয়ে তাহলে পিতার প্রতি অভিমান, ক্রোধ আর ক্ষোভের কতবড় এক পাহাড় বুকে নিয়ে এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেছে লেসলি, কে জানে!

বিশ্বাস করতে শুরু করেছে ও মেয়েটিকে। নিজের সহজাত প্রবৃত্তি আরও আগে থেকেই জানান দিতে শুরু করেছে রানাকে, এ মেয়ে ভুয়া নয়, মাসুদ রানা। খাঁটি। বিশ্বাস করতে পারো তুমি একে।

ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছতে লাগল লেসলি। মুখ তুলতে পারছে না লজ্জায়। তাকে সহজ হতে সাহায্য করল মাসুদ রানা। হাত বাড়াল এলোমেলো চিঠিগুলোর দিকে। 'আপনাকে একটু সাহায্য করি। বেঁধে দিই চিঠিগুলো।' কাজটা শেষ হতে বাণ্ডিলটা বাইবেলের ওপর রাখল রানা, আস্তে করে ঠেলে দিল টেবিলের ও মাথায়। 'নিন। ভরে ফেলুন ব্যাগে।'

কাজ হলো। চোখ তুলে মুহূর্তের জন্যে তাকাল লেসলি, মুখে লাজুক হাসি। নাকের ডগা গোলাপী হয়ে উঠেছে তার। 'দুঃখিত। আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'খুব স্বাভাবিক।'

জিজ্ঞেস করতে হলো না। এক মিনিট পর আপনা থেকেই মুখ খুলল মেয়েটি। 'সে দিন···বড়দিনের দু'সপ্তা বাকি। ১৯৬৯ সাল। খুব শীত পড়েছিল···'

স্কুল থেকে বাসায় ফিরল লেসলি। দুপুর গড়িয়ে গেছে তখন। বিচ্ছিরি আবহাওয়া প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, টিপ টিপ বৃষ্টিও আছে তার সঙ্গে। ছাতাটা ভাঁজ করে বাইরে, দরজার পাশে খাড়া করে রাখল লেসলি পানি ঝরাবার জন্যে। তারপর দরজা খুলে ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল ওদের চার রুমের ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটে। রোজকার মত হাঁক ছাড়ল সে, 'মা! আমি এসে গেছি।'

জবাব দিল না এলিজাবেথ।
'মা-আ! আমি এসে গেছি!'
উত্তর নেই।
ব্যাপার কি! ভাবল লেসলি। এমন তো কখনও হয় না! বাসায় নেই নাকি মা? কিন্তু সামনের দরজা খোলা কেন তাহলে? তাছাড়া ওর স্কুল থেকে ফেরার সময়টায় চিরকাল বাসাতেই থাকেন মা। ছেলেমানুষ, খুব একটা গুরুত্ব দিল না সে ব্যাপারটাকে। খিদে লেগেছে খুব। তাড়াতাড়ি কিচেনে ঢুকে ওর জন্যে ডাইনিং টেবিলে ঢাকা দিয়ে রাখা এক টুকরো পাউরুটি খেলো লেসলি মাখন দিয়ে। তারপর এক গ্লাস কমলার রস।
পেট ঠাণ্ডা হতে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল লেসলি। 'মা!'
এলিজাবেথের বেডরুমের খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল এসে মেয়ে। চমকে উঠল ভেতরে চোখ পড়তে। প্রচণ্ড সাইক্লোন বয়ে গেছে যেন ঘরটার মধ্যে। সারা মেঝেতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে মায়ের এলোমেলো কাপড়-চোপড়। ড্রেসারের ড্রয়ারগুলো একটা এখানে, একটা ওখানে। কোনটা চিত হয়ে আছে, কোনটা উপুড় হয়ে। বিছানার গদি উল্টে পড়ে আছে মেঝেতে। কার্পেট গোটানো লণ্ডভণ্ড অবস্থা।
'মা!' গলা ভেঙে গেল লেসলির। আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। 'মা!'
উত্তর নেই।
ভয়ে ভয়ে ভেতরে ঢুকল লেসলি। কয়েক পা এগিয়ে থেমে পড়ল। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল হতভম্ব দৃষ্টিতে। এই সময় জিনিসটার ওপর চোখ পড়ল তার। বেড কভারটা খাটের ওপাশে দলা হয়ে পড়ে আছে মেঝেতে, রক্তে লালে লাল হয়ে আছে ওটা। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে শুরু করল লেসলি। ঘেমে উঠেছে। অ্যাটাচড বাথরুমের দরজা খোলা দেখা গেল, কোন রকমে সেদিকে দু'পা এগোল মেয়েটি। এবং জমে গেল জায়গায়।
বাথরুমের মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে তার মা। এলিজাবেথ অ্যান চ্যাটসওয়ার্থ স্যান্ডলার। কিচেন অ্যাপ্রন পরা। চেহারায় আতঙ্কের পাশাপাশি প্রচণ্ড অবিশ্বাস মাখা অভিব্যক্তি। চিবুকের খানিকটা নিচে গলা হাঁ হয়ে আছে তার। খুব ধারাল কিছু দিয়ে জবাই করা হয়েছে। মরে পড়ে আছে এলিজাবেথ—লেসলি স্যান্ডলারের দুঃখিনী জননী।
মাথা খারাপ হয়ে গেল লেসলির। চিৎকার করে কেঁদে উঠল। ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল সে, কিন্তু এক পা গিয়েই আবার জমে গেল আঁতকে উঠল সশব্দে। ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছে দীর্ঘদেহী এক লোক। তার হিলের ধাক্কায় দড়াম করে লেগে গেল বেডরুমের দরজা। হাঁ করে ঝাপসা চোখে আগন্তুকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল লেসলি। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে হাত-পা, সারা দেহ।
এক মুহূর্ত, তারপরই মানুষটিকে চিনতে পারল লেসলি। ওই চেহারা বহু বহুবার ছবিতে দেখেছে সে। মার অ্যালবামে আছে ছবিটা। আর্থার স্যান্ডলার।

লেসলির বাবা ওই লোক, জন্মদাতা। এলিজাবেথের প্রাণপ্রিয় স্বামী।

কালো সুট, কালো টাই পরে আছে আর্থার স্যান্ডলার। হাতে কালো রাবার গ্লাভস। লেসলিকে দেখল সে কয়েক মুহূর্ত। তারপর হাসির ভঙ্গি করে এক পা এগিয়ে এল। 'তুমি লেসলি না?' আমেরিকান অ্যাকসেন্টে বলল আর্থার। 'তোমার কথা তোমার মার চিঠিতে পড়েছি আমি।'

উত্তর দিল না লেসলি। ফাঁদে পড়া সন্ত্রস্ত ইঁদুরের মত পালাবার উপায় খুঁজছে। আড়চোখে ঘন ঘন তাকাচ্ছে আর্থারের হাতের দিকে। দেহের পিছনে রয়েছে তার দুই হাত, কি আড়াল করে রেখেছে লোকটা বুঝে উঠতে পারছে না লেসলি। তবে কিছু একটা যে আছে তার হাতে, সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই ওর।

'ভয় পাচ্ছ কেন?' বলল আর্থার স্যাণ্ডলার। 'কাছে এসো। আমি তোমার বাবা। এসো এসো!' আরও এক পা এগোল লোকটা।

লেসলি বুঝল এই মুহূর্তে তার পালানো উচিত। মানুষটা সম্ভবত তাকেও খুন করতে যাচ্ছে। কিন্তু জেনে-বুঝেও নিজেকে এক চুল নড়াতে পারল না লেসলি। মনে হলো যেন দু'পা তার মেঝেতে আটকে দিয়েছে কেউ পেরেক মেরে। একেবারে ওর সামনে এসে দাঁড়াল আর্থার স্যাণ্ডলার, দু'হাত সামনে চলে এসেছে দেহের আড়াল ছেড়ে।

এইবার জিনিসটা চোখে পড়ল লেসলির। দুই পিতলের আংটায় মজবুত করে পেঁচিয়ে বাঁধা দেড় ফুট আন্দাজ সরু পিয়ানোর তার। কিছু করার সুযোগ পেল না লেসলি, চট্ করে তারটা ওর গলায় ফাঁসের মত পরিয়ে দিল আর্থার, দুই আংটায় আঙুল ভরে টান দিল গায়ের জোরে।

গলায় চাপ পড়তেই হুঁশ হলো লেসলির। ভাগ্য ভাল, স্কুলের চামড়ার শক্ত সোলের জুতো তখনও পরে ছিল সে। আরও আগেই খুলে ফেলত সে ওগুলো, যদি ঘরের পরিবেশ আর সব দিনের মত স্বাভাবিক থাকত। গলায় ততক্ষণে শক্ত হয়ে চেপে বসেছে তারের ফাঁস, আর্থারের প্রচণ্ড টানে মাংস কেটে ক্রমেই দেবে যাচ্ছে ভেতর দিকে। জুগুলার ভেইন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। রক্তে ভিজে গেছে তার জামার কলার। মরিয়া হয়ে জুতোর পুরু, শক্ত মাথা দিয়ে আর্থারের হাঁটুতে গায়ের জোরে লাথি হাঁকাল লেসলি। ছোট ছোট দু'হাতে খামচে ধরে আছে সে আর্থারের চওড়া কব্জি।

জায়গামতই পড়ল লাথিটা, ঠিক তার বাঁ হাঁটুর বাটির মাঝামাঝি জায়গায়। বেমক্কা লাথিটা খেয়ে চেঁচিয়ে উঠল আর্থার ব্যথায়, ভাঁজ হয়ে গেল বাঁ পা, দেহের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল লোকটা। আবার লাথি চালাল লেসলি, সেই সঙ্গে দুই হাতের একের পর এক হ্যাঁচকা টানে তারের ফাঁস থেকে মুক্ত করে নিল নিজের প্রায় অর্ধেক বিচ্ছিন্ন গলা। লাফিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার আগে পলকের জন্যে ঘুরে তাকিয়েছিল রক্তাক্ত, আধমরা লেসলি। দেখল, তাকে ধরার জন্যে খোঁড়াতে খোঁড়াতে ছুটে আসছে খুনীটা। ব্যথায় চেহারা বিকৃত হয়ে আছে তার।

এক দৌড়ে রাস্তায় চলে এল লেসলি। জামায়, কোটে নিজের রক্তের নহর বইতে দেখে ভয়ে মাথা ঘুরে গেল তার। পথের ওপরই পড়ে গেল সে জ্ঞান

হারিয়ে। প্রতিবেশীরা এসে পড়ায় সে-যাত্রা বেঁচে যায় লেসলি। পুলিসে, হাসপাতালে টেলিফোন করে তারা। একটা মার্ডার, আরেকটা ব্যর্থ মার্ডার কেস-পুলিস, সাংবাদিক আর টিভি ক্যামেরায় সরগরম হয়ে উঠল সমগ্র এলাকা।

তবে আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, পুলিস কতদূর কি করেছে জানে না লেসলি। চোখে দেখেনি। আর ছেলেমানুষ, দেখলেই বা কতটা বুঝত কে জানে? কিন্তু ডজন ডজন সাংবাদিক আর টিভি ক্যামেরা এল, তবু এলিজাবেথ আর লেসলির খবর তেমন প্রচার পেল না। টিভি খবরে আর্থার স্যাণ্ডলার প্রসঙ্গে একটা শব্দও উচ্চারিত হলো না, পত্রিকায় ছাপা হলো না তার নাম। অথচ জ্ঞান ফেরার পর ওই নামটা সম্ভবত কয়েক হাজারবার ঘোরের মধ্যে উচ্চারণ করেছে লেসলি উপস্থিত সবার সামনে। কেউ একবার জানতেও চাইল না, কেন একজন মৃত ব্যক্তির নাম বারবার উচ্চারণ করছে সে। সংবাদটা নিতান্তই গুরুত্বহীনভাবে প্রকাশ পেল, এবং খুনীকে 'অজ্ঞাতপরিচয়' বলে উল্লেখ করা হলো।

ওদিকে আর্থার স্যান্ডলার পালিয়ে গেল। পিছনে কোন সূত্র রেখে যায়নি লোকটা। কোনদিক দিয়ে পালাল সে, কেউ দেখেনি। এ ঘটনা নিয়ে একটা লোক দেখানো মামলা দায়ের করা হয়েছিল বটে, তবে তার ফল কি হয়েছে জানে না লেসলি। খোঁজ রাখেনি।

'সেদিন থেকেই আত্মরক্ষার স্বার্থে প্রতিটি মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে শিখেছি আমি, মিস্টার···ইয়ে, মাসুদ রানা। নয় বছরের একটি শিশু, সেদিনই প্রথম বুঝতে পেরেছে পৃথিবী কত নিষ্ঠুর। কতবড় পাষণ্ড। অসতর্ক থাকলে মুহূর্তের জন্যেও তাকে বাঁচতে দেবে না সে। সেদিনের খুনী আর্থার স্যান্ডলারের চেহারা চোখ বুজলে এখনও দেখতে পাই আমি মৃত্যুর আগমুহূর্ত পর্যন্ত আমার মনে থাকবে তার সেই অভিব্যক্তি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল লেসলি। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে আনমনে মাথার এক গোছা চুল পেঁচাচ্ছে সে। হঠাৎ খেয়াল হলো, মাসুদ রানা তাকিয়ে আছে তার হাতের দিকে। নামিয়ে নিল সে হাতটা কি ভেবে ব্যাগ খুলল। 'আরেকটা জিনিস আছে আমার কাছে। এটা আপনি রেখে দিতে পারেন।'

একটা পাসপোর্ট সাইজ ছবি বের করল লেসলি, এগিয়ে দিল মাসুদ রানার দিকে। 'ইনি-ই তিনি,' ব্যঙ্গের সুরে বলল সে। 'আর্থার স্যান্ডলার।'

আলতো করে ধরল রানা ছবিটা। চোখের সামনে নিয়ে হাতের তালুতে রেখে দেখল কিছুক্ষণ। কিন্তু না, নামের মত চেহারাটাও অজানা ওর। লোকটিকে চেনে না মাসুদ রানা।

'কবে তোলা হয় এটা?' প্রশ্ন করল ও।

'১৯৫৯ সালে। মার সঙ্গে লোকটার বিয়ের পরদিন। নিজের ক্যামেরায় নিজেই ও ছবি তোলেন আমার মা।'

'এটা আমাকে রাখতে দিচ্ছেন আপনি?'

'হ্যাঁ, রাখুন।'

ড্রয়ার খুলে আগের মতই আলতো করে ওটা রেখে দিল মাসুদ রানা। 'পরের ঘটনা বলুন এবার।'

'মায়ের তরফের কোন আত্মীয় ছিল না আমার, কাজেই সেদিনই ডেভনের এক এতিমখানায় ঠাঁই করে দেয়া হলো আমার জন্যে। ওখানেই ঘটল আমার জীবনের আরেক স্মরণীয় ঘটনা। লণ্ডন থেকে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দু'জন এল আমার সঙ্গে কথা বলতে। তারা ফিরে গিয়ে খুব সম্ভব গোয়েন্দা সংস্থা এম আই-সিক্সকে জানাল আমার রেকর্ড করে নিয়ে যাওয়া বক্তব্য।'

চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। 'এম আই-সিক্স?'

'হ্যাঁ।'

'এমন ধারণা কেন হলো আপনার?'

'বলছি। একদিন পর আরও দু'জন এল, সাদা পোশাকের দুই পুলিস অফিসার। গাড়িতে করে লণ্ডন নিয়ে গেল আমাকে তারা। বড় একটা সরকারী অফিসে নেয়া হলো। ওটার প্রতিটি রুমে ইংল্যাণ্ডের রানীর ছবি ঝোলানো। আর প্রধানমন্ত্রীর ছবি। আমি ছোট ছিলাম ঠিকই, কিন্তু আমার চারদিকে আমাকে ঘিরেই যে সমস্ত কর্মকাণ্ড চলছে, তার কিছু কিছু আমি টের পেয়েছি। অনেকে মনে করে ছোটরা কিছু বোঝে না। আসলে ভুল। অনেক কিছুই বোঝে তারা; কেবল গুছিয়ে বলতে পারে না, এই যা। আমিও বুঝেছি কেন কি হচ্ছে। বুঝেছি ওরা সবাই আমাকে লুকিয়ে রাখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কোথায় রাখবে, তাই নিয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়ে গেছে। অফিশিয়ালি মৃত আমেরিকান মিলিয়নেয়ার আর্থার স্যান্ডলারের 'বেঁচে ওঠার' খবরে যথেষ্ট বিচলিত দেখেছি আমি তাদের প্রত্যেককে। তার হাত থেকে আমাকে কি উপায়ে বাঁচানো যায় তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখেছি আমি মানুষগুলোকে। তারা এমনকি আমার মায়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াতেও যেতে দেয়নি আমাকে।'

'এদের কারও নাম বলতে পারেন?'

'যিনি ইন-চার্জ, তাঁর নাম ছিল পিটার হোয়াইটসাইড। ভদ্রলোককে ভালই লাগত আমার। লম্বা, হালকা-পাতলা, খুব হ্যাণ্ডসাম। ভাল মানুষ। আমার ধারণা এই মানুষটিই প্রথম আমার কথা, সব কথা, বিশ্বাস করেছিলেন। অনুধাবন করতে পেরেছিলেন আমার বেদনা। আমার কষ্ট।'

'পিটার হোয়াইটসাইড, না?' নামটা পরিচিত মনে হলো রানার। সমসাময়িক নয় অবশ্য, ওর চাইতে বেশ সিনিয়র এ লাইনে। তবে নামটা শুনেছে, এ বিষয়ে রানা নিশ্চিত।

'হ্যাঁ। এই ঘটনার অনেক আগেই অবসর নিয়েছেন তিনি সরকারী চাকরি থেকে। কিন্তু তাঁর চাল-চলন, স্বাস্থ্য দেখলে খুব একটা বয়সী মনে হত না। বেশ চটপটে মানুষ। আমার জীবনে এই লোকটির অবদানের কথা ভুলব না আমি। আসলে তাঁর হস্তক্ষেপের জন্যেই এখনও আমি বেঁচে আছি, অন্তত ভদ্রভাবে বলতে গেলে নতুন জীবন দান করেছেন আমাকে পিটার হোয়াইটসাইড।'

'যেমন?'

'তাঁর বাসায় কিছুদিন রাখেন তিনি আমাকে। বাসার চারদিক চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দিত কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিস। কুকুর থাকত তাদের সাথে। সেখান থেকে সুইটজারল্যাণ্ডের ভিডি পাঠিয়ে দেন আমাকে তিনি। বয়স্ক এক

ব্রিটিশ দম্পতির কাছে। নিঃসন্তান ছিলেন বুড়ো-বুড়ি। তাঁরা আমাকে 'দত্তক' নেন। ভদ্রলোকের নাম জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম। লেসলি স্যান্ডলার আগেই মরেছে বলেছি আপনাকে। যেদিন ভিভি পা রাখলাম, সেদিন নতুন টাইটেল গ্রহণ করলাম আমি। হয়ে গেলাম লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম।'

'ভদ্রলোক সাধারণ ব্রিটিশ নাগরিক?'

নীরবে কয়েক মুহূর্ত মাসুদ রানাকে দেখল মেয়েটি। মাথা দোলাল। 'না, রানা। আমার জীবনে কেউই সাধারণ নয়। তারা সবাই একেকজন অসাধারণ। আমি নিজেকেও তাই ভাবি। যদি সাধারণ-ই হব, আমার চারপাশে কেন তাহলে এত অসাধারণ ঘটনা-দুর্ঘটনার মেলা? কেন এত অসাধারণ সব মানুষজনের আনাগোনা? সে যাক, ম্যাকঅ্যাডামও তেমনি ছিলেন।

'প্রথমে শুনলাম, "সড়ক দুর্ঘটনায়" আহত, পঙ্গু হয়ে গেছেন বলে সরকারী চাকরি থেকে "অবসর" দিয়েছে তাঁকে ব্রিটিশ সরকার। কিন্তু আমার সন্দেহ হয় কেন জানি। আমি বিশ্বাস করিনি। কয়েক বছর পর জানলাম আসল খবর। এম আই-সিক্সের এক শীর্ষস্থানীয় অপারেটিভ ছিলেন তিনি। সোজা কথায় স্পাই মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত ছিলেন, সুয়েজে। ১৯৫৫ সালে অজ্ঞাত পরিচয় এক আরবের গুলিতে আহত হন ম্যাকঅ্যাডাম। গুলিটা লেগেছিল তাঁর নিতম্বে, ঠিক মেরুদণ্ডের শেষ মাথায়। ফলে দু'পায়ের কিছু কিছু নার্ভ শুকিয়ে যায় ভদ্রলোকের, প্রায় পঙ্গু হয়ে যান। তাই "অবসর" নিতে বাধ্য হন।'

'তারপর?'

'যে কয় বছর ওঁদের সঙ্গে ছিলাম, ভালই ছিলাম আমি। সুখে ছিলাম। জীবনের ওই সময়টাই সবচে' আনন্দে কেটেছে আমার। ভিভির এক প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হয় আমাকে। স্কুলের লোকেশনটা ছিল দারুণ। জেনেভা লেক, ফরাসী আলপস্ দেখা যেত আমাদের ক্লাসরূম থেকে। পিটার হোয়াইটসাইডের দয়ায় ভাল ভাল পোশাক কিনতে পারতাম আমি, দামী খাবার খেতাম। আমার জন্যে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন তিনি জর্জ ম্যাকঅ্যাডামের নামে অনেক বন্ধু জুটে গেল আমার ওখানে, মেয়ে বন্ধু, ছেলে বন্ধু। ও দেশে থেকে ফ্রেঞ্চ আর জার্মান শিখলাম। ইংরেজির মত সচ্ছন্দে কথা বলতে পারি আমি ওই দুই ভাষায়।'

আপনমনে মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'সাত বছর কেটে গেল দেখতে দেখতে। আসলে এমনিই হয়, সুখের সময় খুব দ্রুত কেটে যায় মানুষের। ১৯৭৬ সালে আবার আমাকে খুঁজে বের করল আর্থার স্যান্ডলার। জীবনের দ্বিতীয় এবং শেষবারের মত তাকে পলকের জন্যে দেখতে পেলাম আমি আবছা আঁধারে দাঁড়ানো অবস্থায়।'

বলে চলল লেসলি।

১৯৭৬ সাল। সময়টা গ্রীষ্মে। স্কুলের পাট চুকিয়ে ফেলেছে লেসলি। দেখতে মায়ের মতই সুন্দরী, ডাগরডোগর হয়ে উঠেছে। অনেকেরই চোখ পড়েছে তার ওপর, কিন্তু তাদের কাউকে মনে ধরে না তার। লুটরির এক বোট বেসিনে চাকরি নিল লেসলি সে বছর জুলাই মাসে। সেখানে রবার্টো জিসারেল্লি নামে এক

ইটালিয়ান সুঠামদেহী যুবকের সঙ্গে পরিচয় হয় লেসলির। অত্যন্ত হ্যান্ডসাম ছেলে জিসারেল্লি। কি যেন এক সুইস-ইটালিয়ান কোম্পানিতে বড় পদে চাকরি করে খরচের বেলায় দরাজ হাত।

ছেলেটির প্রেমে পড়ল লেসলি। পড়ল ইটালিয়ানও। রোজ বিকেলে এসে লেসলির ছুটি হওয়ার অপেক্ষায় বসে থাকত সে। তারপর সন্ধে পর্যন্ত ঘুরে বেড়াত দু'জনে মিলে, গল্প করত, পার্কে বসে সময় কাটাত। এভাবে দু'সপ্তাহ কাটল। তারপর একদিন তার সঙ্গে শোয়ার জন্যে বলল যুবক লেসলিকে। প্রথমে আপত্তি জানাল ও; কিন্তু পিছু ছাড়ল না যুবক, লেগেই থাকল। অবশেষে সম্মত হলো লেসলি।

নিজেই যেচে আহ্বান জানাল জিসারেল্লিকে। 'আমার বাবা-মা শহরের বাইরে গেছেন কয়েকদিনের জন্যে। আমাদের ফ্ল্যাট খালি।'

প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে নিজেদের দোতলার ফ্ল্যাটে এল লেসলি। ভীষণ উত্তেজিত সে, তেমনি ভয় ভয়ও করছে। জীবনে এই প্রথম কোন পুরুষের সঙ্গে শুতে যাচ্ছে, ভয় করাই স্বাভাবিক। নিজের বেডরুমে জিসারেল্লিকে নিয়ে এল সে আলো নিভিয়ে বাতাস চলাচলের জন্যে ফ্ল্যাটের পিছনের একটা জানালা খুলে দিল যুবক; মৃদু আপত্তি জানিয়েছিল বটে লেসলি, কিন্তু কানে তুলল না ইটালিয়ান বলল, গরম লাগছে। মিথ্যে বলেনি অবশ্য সে। বেশ গরম পড়েছিল সেবার গ্রীষ্মে

যা হোক, কাঁপা হাতে নিজের কাপড়-চোপড় খুলল লেসলি, কিন্তু জিসারেল্লির মধ্যে তেমন ব্যগ্রতা দেখা গেল না। ব্যাপারটা যখন খেয়াল হলো, সে তখন সম্পূর্ণ নগ্ন। 'কি হলো?' জানতে চাইল লেসলি 'তুমি খুলছ না কেন?'

'আমি খুব দুঃখিত, লেসলি,' গম্ভীর গলায় বলল যুবক।

'কেন?' অবাক হলো ও খুব।

হাত ইশারায় খোলা জানালাটা দেখাল জিসারেল্লি। 'তাকাও ওদিকে। বাইরে দেখো।'

ইতস্তত ভঙ্গিতে জানালার দিকে এগিয়ে গেল লেসলি। চাঁদের আলোয় পিছনের বাগান মোটামুটি দেখা যায়। শুধু বাগানটাই দেখল লেসলি, আর কিছু চোখে পড়ল না। ঘুরে তাকাল ও, ঠিক ওর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে তখন যুবক 'কই! কিছুই তো চোখে পড়ছে না! কিসের কথা বললে তুমি?'

কড়া গলায় প্রায় ধমকেই উঠল ইটালিয়ান। 'ভাল করে তাকিয়ে দেখো!'

তাকাল হতভম্ব লেসলি। এবং পরমুহূর্তে আঁতকে উঠল সশব্দে। ওর খোলা জানালার সরাসরি নিচে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘদেহী কে একজন যেন। মুখ তুলে ওপরদিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। চাঁদের আলোয় তাকে চিনতে সময় লাগল না লেসলির। আর্থার স্যান্ডলার! ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতে ক্রূর এক টুকরো হাসি দিল লোকটা।

চরকির মত ঘুরে দাঁড়াল লেসলি, দৌড় দেয়ার জন্যে পা তুলল, কিন্তু পেশীবহুল শক্ত হাতে ধরে ফেলল ওকে জিসারেল্লি। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'পালাবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, লেসলি।' দু'হাতের বজ্রমুঠিতে ওর গলা চেপে ধরল সে। 'আমি খুবই দুঃখিত।' দুই বুড়ো আঙুল ওর কণ্ঠমণির ওপর রেখে

সর্বশক্তিতে চাপ দিল জিসারেল্লি।

চোখ কপালে উঠল লেসলির চাপ খেয়ে, প্রথম ধাক্কাতেই জিভ বেরিয়ে পড়ার দশা। ওহ্, ঈশ্বর! ভাবল মেয়েটি, এত বছর পর সত্যিই তাহলে সফল হতে যাচ্ছে আর্থার স্যান্ডলার? সত্যিই তাহলে মরে যাচ্ছে লেসলি? নিজেকে ছাড়াবার জন্যে উন্মাদের মত টানা-হ্যাঁচড়া, লাফঝাঁপ শুরু করে দিল সে। এক মুহূর্তের জন্যেও খুনীটাকে সুস্থির থাকতে দিতে চায় না। ও বেশি ঝামেলা করছে দেখে এক সময় বিরক্ত হয়ে উঠল জিসারেল্লি, ওই অবস্থায়ই ঠেলে নিয়ে চলল তাকে বিছানার দিকে।

কিনারা পর্যন্ত নিয়ে লেসলিকে বিছানায় ফেলে দিল যুবক চিত করে, দু'পা দু'দিকে ছড়িয়ে দিয়ে উঠে বসল তার পেটের ওপর। তারপর নতুন উদ্যমে টিপে ধরল ওর গলা। বিস্ফারিত চোখে খুনী প্রেমিকের দিকে তাকিয়ে আছে লেসলি, নখ দিয়ে তার চওড়া কব্জি আঁচড়ে খামচে রক্তাক্ত করে ফেলেছে সে, কিন্তু কিছুতেই টলানো যাচ্ছে না ইটালিয়ানকে। গায়ের জোরে গলা টিপে ধরে ঘন ঘন ঝাঁকাচ্ছে সে ওকে।

জ্ঞান হারাতে বসেছে প্রায় লেসলি, এই সময় মনে পড়ল ছুরিটার কথা। ওটা তার সার্বক্ষণিক সঙ্গী, সেই ১৯৬৯ সাল থেকে। একটু আগেও সঙ্গে ছিল ওটা, কাপড় ছাড়ার সময় বালিশের নিচে গুঁজে রেখেছে। জিসারেল্লির কব্জি ছেড়ে সেদিকে ডান হাতটা বাড়াল লেসলি, হাতড়ে হাতড়ে বালিশগুলোর স্পর্শ পেল, হাত ভরে দিল সে ওর তলায়। তারপর ছুরিটার বাঁট মুঠোয় চেপে ধরল লেসলি।

এবং দেহের অবশিষ্ট শক্তি ও অন্তরের সমস্ত ঘৃণা এক করে চালাল সে ছুরি। জিসারেল্লির বাঁ শোল্ডার ব্লেডের নিচ দিয়ে ঢুকে গেল তীক্ষ্ণধার ইস্পাতের ফলা। আর্তনাদ করে উঠল যুবক, আচমকা গলার চাপ কমে গেল লেসলির। কিন্তু ছাড়ল না ও, জোর এক ঠেলা দিয়ে ফলাটা আরও ইঞ্চিখানেক ভেতরে সেঁধিয়ে দিল। আবার চেঁচিয়ে উঠল ইটালিয়ান। ওকে ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিজেকে নিয়ে। পেটের ওপর থেকে যুবক নেমে পড়তেই উঠে বসল লেসলি ভয়ঙ্করভাবে কাশতে কাশতে। হিংস্র বাঘিনী হয়ে উঠেছে।

ছুরি লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিল লেসলি, আরেক ঠেলা দিয়ে একেবারে বাঁট পর্যন্ত ঢুকিয়ে দিল যুবকের হাড় মাংসের ভেতরে। পিছন দিকে ধনুকের মত বাঁকা হয়ে গেল জিসারেল্লি। তীব্র যন্ত্রণা ও অবিশ্বাস মাখা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লেসলির দিকে। যেন ভেবে পাচ্ছে না, ওর মত দুর্বল আর নগ্ন এক মেয়ে তাকে আঘাত করার মত স্পর্ধা কোথায় পেল। কোমরের ওপরের অংশ বাঁকা করে মুখ ঘোরাবার আপ্রাণ চেষ্টা করল জিসারেল্লি, যেন দেখতে চায় ক্ষতটা। এক মুহূর্ত সংগ্রাম করল যুবক পিছনদিকটা দেখার জন্যে, তারপরই চোখ উল্টে গেল তার। হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে মেঝেতে।

'ছেলেটার পরিচয় জানা হলো না আমার। তবে যে-ই হোক, আমার ঘরে, আমারই চোখের সামনে ছটফট করতে করতে মারা গেল সে।' ঠোঁট বাঁকা করে হাসির ভঙ্গি করল লেসলি। 'আমার প্রথম প্রেমিক। কিন্তু তা নিয়ে বিন্দুমাত্র আফসোস হয়নি আমার। আফসোস হয়েছে কেবল আর্থার আবারও পালিয়ে গেল

বলে। জিসারেল্লির পরিবর্তে সেদিন যদি আমি ওই পিশাচটাকে হত্যা করতে পারতাম, জীবন ধন্য হত আমার। সে রাতের পর অনেক বছর কেটে গেল, আর কখনও দেখিনি তাকে। কোথায় আছে সে ঘাপটি মেরে, কে জানে!'

'মরে গিয়েও তো থাকতে পারে।' বলল মাসুদ রানা।

'ওরা মরে না, মাসুদ রানা,' ধীর, অথচ দৃঢ় কণ্ঠে ওর ধারণা প্রত্যাখ্যান করল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'আর্থার স্যাণ্ডলাররা কখনও মরে না। ও বেঁচে আছে, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। এবং ওর-ই জন্যে আগুন খুঁজে নিয়েছে আপনাকে, বুঝতে পারছেন না এখনও? আমি বলছি, আজ হোক, কাল হোক, আমার কথার সত্যতা আপনি নিজেই টের পাবেন।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে আছে মেয়েটির দিকে ভাবছে। তাই কি? আজই সকালে নিজস্ব চ্যানেলে মার্ক রাইডারের ময়না তদন্তের একটা রিপোর্ট কপি হস্তগত করেছে রানা। ওতে তার মৃত্যুর সময় পরিষ্কার উল্লেখ আছে। সে রাতে যে সময়ে অ্যাপার্টমেন্ট ত্যাগ করে মাসুদ রানা, ঠিক সেই সময়ই নিহত হয় মার্ক রাইডার। কি অর্থ হতে পারে এর?

লম্বায়, পাশে প্রায় মাসুদ রানারই মত ছিল হতভাগ্য যুবক। কেউ কি ভুলে রানা ভেবে আক্রমণ করেছিল রাইডারকে? পিছন দিয়ে না বেরিয়ে যদি সামনে দিয়ে বের হত মাসুদ রানা, তাহলে কি···অফিসে আগুন ধরিয়ে অসময়ে ওকে ঘর থেকে বের করে আনতে চাইছিল কেউ? কে, আর্থার স্যান্ডলার? সচকিত হলো রানা লেসলির গলা কানে যেতে।

'খবর পেয়ে পরদিনই আমার পালক মা-বাবা ফিরে এলেন ভিভি। এসেই লণ্ডনে যোগাযোগ করেন জর্জ, পিটার হোয়াইটসাইডের সঙ্গে কথা বলেন টেলিফোনে। ঘটনা শুনে জেনেভার ব্রিটিশ কনস্যুলেটের সাথে কথা বলেন পিটার এরপর সুইস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে ফয়সালা করা হয় বিষয়টার। ঘটনাটা চেপে যায় ওরা। তবে আমি সুইটজারল্যাণ্ড ত্যাগ করতে বাধ্য হই। কারণ সুইসরা ঝামেলা আমদানীকারীদের পছন্দ করে না।

'আবারও ঝামেলা থেকে রক্ষা করলেন আমাকে পিটার হোয়াইটসাইড। খেটেপিটে কানাডায় আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। চলে গেলাম আমি। যাওয়ার আগে আমার পালক বাবা এই চিঠিপত্র আর বাইবেলটা আমাকে দিয়ে বললেন, "সব সময় সঙ্গে রেখো। কখন কাজে লাগবে বলা যায় না।" ' নিয়ে নিলাম। ব্যাগ থেকে একটা নোটবই বের করে ভেতরে চোখ বোলাল লেসলি ম্যাক্অ্যাডাম।

মুখ তুলল। 'আজ থেকে ছয় বছর পাঁচ মাস আঠারো দিন আগে আমাকে কানাডায় টেলিফোন করেছিলেন উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস। জানালেন, স্যান্ডলার পরিবারের যাবতীয় সহায় সম্পত্তির দলিল সব আমার নামে নতুন করে তৈরি করে রেখে যাচ্ছেন তিনি। ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর কার্যকর হবে সে সব। ইউ সী? মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এখন আমি আমার ন্যায্য পাওনা বুঝে নিতে চাই। আমি আশা করব, এ ব্যাপারে আপনি সাহায্য করবেন আমাকে আপনার যেভাবে খুশি, আমার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নিতে পারেন আপনি

'আপনি নিজেই বললেন আর্থার স্যান্ডলার এখনও বেঁচে আছে,' নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। 'তাকে আপনি ভয়ও করেন। এমন এক মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করা কি ঠিক হবে আপনার?'

হাসল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'মাসুদ রানা, ড্যানিয়েলসের মুখে আপনার নাম শোনার পর আপনার ব্যাপারে যতদূর সম্ভব খোঁজ-খবর নিয়েছি আমি। আমি জানি আপনার পেশা কি। এ-ও জানি সব সময় অত্যাচারিতের, শোষিতের পক্ষে কাজ করে থাকেন আপনি। আমিও পড়ি অত্যাচারিতের দলে, শোষিতের দলে। বিপদে যদি পড়ি, আপনি কি সাহায্য করবেন না আমাকে? আমার জীবন-কাহিনী শোনার পরও? ভেবে দেখুন, ড্যানিয়েলস আমার নিরাপত্তার ভার প্রকারান্তরে আপনার হাতেই তুলে দিয়ে গেছেন।'

কথার মারপ্যাঁচে পড়ে আমতা আমতা করতে লাগল মাসুদ রানা। 'ড্যানিয়েলসকে আপনি চেনেন কি ভাবে?'

'না। তাঁকে আমি চিনি না।'

'সে কি!'

'এমনকি তাঁর ফোন পাওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁর নামটাও কোনদিন শুনিনি। তবে…বোঝাই যায়, আমাকে তিনি খুব ভালই চিনতেন। খোঁজ-খবর রাখতেন আমার।'

'একটা বিষয় পরিষ্কার হচ্ছে না আমার কাছে।'

'কি?'

'কাহিনী শুনে পরিষ্কার বোঝা যায় আপনার মাকে খুব ভালবাসত আর্থার স্যান্ডলার। হঠাৎ কী এমন হলো তার যে স্ত্রীকে হত্যা করল সে? নিজের মেয়েকে হত্যা করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছিল?'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লেসলি। 'জানি না।' একটু চুপ করে থাকল সে। 'আপনি কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি এখনও।'

'কোন্ প্রশ্ন?'

'যদি কোন বিপদে পড়ি এ দেশে, সাহায্য করবেন না আপনি আমাকে?'

'আপনি কি আমাকে আর্থার স্যান্ডলারের পিছু লাগতে বলছেন পরোক্ষে?'

'না। তবে সে যদি লাগে আপনার পিছনে, আপনি কি ছেড়ে দেবেন তাকে?'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

আসন ছাড়ল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'আপনাকে বোধহয় চিন্তায় ফেলে দিলাম। আপনি ভেবে দেখুন বিষয়টা নিয়ে। দু'দিন পর আবার যোগাযোগ করব আমি।'

চলে গেল মেয়েটি। অনেকক্ষণ পর খেয়াল হলো মাসুদ রানার, লেসলি কোথায় আছে জানিয়ে যায়নি ওকে।

# পাঁচ

সকাল সাড়ে ন'টায় নিউ ইয়র্কের মেরিন এয়ার টার্মিনাল ছেড়ে আকাশে উঠল

এয়ার নিউ ইংল্যাণ্ডের খুদে ডি হেভিল্যাণ্ড স্টল বিমানটি। মাত্র নয়জন যাত্রী, তার মধ্যে মাসুদ রানা একজন। নানটুকেট চলেছে রানা ড্যানিয়েলসের এককালের সহকর্মী, অ্যাডলফ জেঙ্গারের সঙ্গে দেখা করতে।

ভদ্রলোককে চেনে না মাসুদ রানা, দেখেওনি কোনদিন। ও যখন একটা জটিল মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে উইলিয়াম ড্যানিয়েলসের সঙ্গে বেশ কয়েক বছর আগে দেখা করতে গিয়েছিল, তার বছর পাঁচেক আগেই আইন ব্যবসা ছেড়ে দেন ভদ্রলোক। যদিও ড্যানিয়েলসের তুলনায় বয়স যথেষ্ট কম ছিল তাঁর। কেন যেন হঠাৎ করেই ব্যবসার প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে জেঙ্গারের, সব ছেড়েছুড়ে ম্যাসাচুসেটস চলে যান তিনি স্বেচ্ছা অবসর নিয়ে। এ সবের কিছু কিছু ড্যানিয়েলসের মুখে শুনেছে মাসুদ রানা, বাকিটা ম্যানহাটনে প্র্যাকটিসরত ওর নিজের এক কাউন্সেলর বন্ধুর কাছ থেকে জেনে এসেছে নিজের গরজে। তার মুখে শুনেছে মাসুদ রানা, এক সময় স্যান্ডলার এস্টেট জেঙ্গারও দেখাশোনা করতেন ড্যানিয়েলসের মত।

গতকাল দুপুরে অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্যে টেলিফোন করেছিল রানা জেঙ্গারকে। প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করেন বৃদ্ধ। কিন্তু যখন জানতে পারলেন এর সঙ্গে স্যান্ডলারদের সম্পর্ক আছে, আর দ্বিমত করেননি।

ঠিক বারোটায় নানটুকেট অবতরণ করল স্টল। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে একটা ক্রাইসলার ট্যাক্সি নিল মাসুদ রানা। ড্রাইভারকে প্রাক্তন অ্যাটর্নির বাসার ঠিকানা জানিয়ে আরাম করে বসল। খুদে বিমানের অপরিসর সীটে সোজা হয়ে বসে থেকে খিল ধরে গেছে হাত-পায়ে।

সাগরের খুব কাছে বাস জেঙ্গারের। বাড়িটা পুরানো, সাদা রং করা। সামনে পিছনে প্রচুর জায়গা আছে ওটার। সামনে ঘন সবুজ ঘাসের লন, বাউণ্ডারি ঘেঁষে চমৎকার ফুলের বাগান নিরিবিলি পরিবেশ, অবসর যাপনের জন্যে একেবারে আদর্শ জায়গা। বাড়িটার কয়েকশো গজ পিছনে সাগর। কাঠের একটা জেটি দেখা যাচ্ছে তীরে। গভীর সমুদ্রে প্লেজার ট্রিপে যাওয়ার উপযুক্ত বড়সড় দুটো, অত্যাধুনিক ট্রলার বাঁধা আছে জেটিতে। ক্রিস-ক্র্যাফট বলে এগুলোকে। নিশ্চয়ই গভীর সাগরে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে ভদ্রলোক, ভাবল মাসুদ রানা। সামনে দাঁড়িয়েই দেখতে পেল ও, ইঁট বাঁধানো একটা সরু রাস্তা জেটি আর জেঙ্গারের বাড়ির পিছনটা যুক্ত করে রেখেছে।

বেল বাজাল মাসুদ রানা। সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল ওক কাঠের তৈরি ভারি, নিরেট দরজা। অ্যাপ্রন পরা এক বৃদ্ধাকে দেখা গেল সামনে। 'মিস্টার মাসুদ রানা?' ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে জানতে চাইল মহিলা।

'হ্যাঁ।'

'আসুন, স্যার।'

পথ দেখিয়ে সীটিংরুমে নিয়ে এল সে রানাকে। রুমটা দামী, কিন্তু পুরানো সব ফার্নিচারে ঠাসা। ঠিক মাঝখানে বড় একটা গদি মোড়া আর্ম চেয়ারে বসে আছেন এক বৃদ্ধ। পঁচাত্তরের কম হবে না তাঁর বয়স, অনুমান করল মাসুদ রানা। তবে দেহ এখনও বেশ শক্তপোক্ত, দেখে মনে হয় নিয়মিত ব্যায়াম করেন। একটা জানালার সামনে বসে আছেন তিনি। সাগর, নানটুকেট সাউণ্ড দেখা যায় ওখান

থেকে।

অপলক চোখে কিছু সময় ওকে দেখলেন বৃদ্ধ। হাত ইশারায় মুখোমুখি একটা সোফা দেখালেন। 'বসুন। আমি অ্যাডলফ জেঙ্গার।'

'ধন্যবাদ।' বসল মাসুদ রানা।

'প্রাইভেট একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম পরিচালনা করেন আপনি, সেরকমই কিছু একটা সম্ভবত বলছিলেন কাল টেলিফোনে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

কি ভেবে হাসল বৃদ্ধ। 'অনেক বছর হলো নিউ ইয়র্ক ছেড়েছি। মাঝেমধ্যে যেতে মন চায়, ইচ্ছে হয় দেখে আসি কেমন হয়েছে এখন শহরটা। কিন্তু ভয় লাগে যেতে। সাহস হয় না।'

'ভয় কেন?'

'ভীষণ ব্যস্ত শহর, আমাদের মত বুড়ো-হাবড়াদের একেবারেই বেমানান মনে হয় নিউ ইয়র্কে। নিউ ইয়র্ক হচ্ছে আপনাদের মত ইয়ংম্যানদের জন্যে। প্রাণ আছে যাদের, যৌবন আছে, উচ্ছলতা আছে, তাদেরই মানায় নিউ ইয়র্কে। আমরা হাঁটতে গেলে হয়তো বাসের ধাক্কা খাব, ট্যাক্সির গুঁতো খাব, সেই ভয়ে যাই না।'

অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। মুখ ঘুরিয়ে সাগরের দিকে তাকালেন। একভাবে তাকিয়ে থাকলেন। 'দেখেছেন?' বিড় বিড় করে প্রশ্ন করলেন তিনি।

'কি?' সামান্য ঝুঁকল মাসুদ রানা।

'সাগর। মহাসাগর,' আবেগ কাঁপা কণ্ঠে বললেন জেঙ্গার। 'দেখুন, যতদূর দেখা যায় শুধু পানি আর পানি। ঢেউ আর ঢেউ।' ফোঁস করে দম ছাড়লেন বৃদ্ধ। আপনমনে মাথা দোলালেন। 'সময় হয়ে এসেছে। আর বেশি দেরি নেই। একদিন হঠাৎ করেই হারিয়ে যাব আমি, চলে যাব দীর্ঘ সাগর যাত্রায়। ডুব দিয়ে আর কোনদিন ফিরব না।'

বুঝল মাসুদ রানা, মৃত্যুর কথা বোঝাতে চাইছেন প্রাক্তন কাউন্সেলর। 'আপনাকে আমার যথেষ্ট সবল মনে হচ্ছে, মিস্টার জেঙ্গার।'

নেতিবাচক ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন তিনি। 'ডাক এসে গেছে, বুঝতে পারছি আমি। সময় হলে সবাইকেই যেতে হবে, মিস্টার রানা। আমার সময় হয়ে গেছে। অনেক তো হলো, আর কত?' হঠাৎ করেই যেন সচকিত হলেন জেঙ্গার। 'সে যাক। আপনি আমার দর্শন শুনতে এতদূর ছুটে আসেননি। সরি। বলুন, কেন দেখা করতে চেয়েছিলেন আপনি আমার সঙ্গে?'

'আমি স্যান্ডলার পরিবার সম্পর্কে জানতে আগ্রহী।'

কোঁচকানো কপাল আরও কুঁচকে উঠল অ্যাটর্নির। 'স্যান্ডলার পরিবারের কোন বিষয়ে জানতে চান?'

'যাবতীয় কিছু। আপনি যা জানেন।'

'কেন? তাদের সম্পর্কে আপনার এ আগ্রহের কারণ কি?'

'ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলার মারা গেছেন ক'দিন আগে।'

'জানি। খবরের কাগজ পড়ি আমি নিয়মিত। টিভিও দেখি।'

'মৃত্যুর কিছুদিন আগে ওই পরিবারের যাবতীয় দলিলপত্র আমার জিম্মায়

রেখে যান উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস।'

'হোয়াট!' বসা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন বৃদ্ধ। ভুরু কপালে চড়ে বসেছে 'আ-আপনার কাছে! কেন, আপনার কাছে কেন রেখে যাবে সে ওসব?'

ড্যানিয়েলসের সন্দেহের, আশঙ্কার বিষয়টা ব্যাখ্যা করল মাসুদ রানা।

শুনে চুপসে গেলেন অ্যাডলফ জেঙ্গার। 'আই সী! এতদূর গড়িয়েছিল? আশ্চর্য!'

'আপনি নিজেও এক সময়ে স্যান্ডলার এস্টেট দেখাশোনা করেছেন ড্যানিয়েলসের সাথে। নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানেন আপনি ওদের ব্যাপারে।'

মাথা দোলালেন বৃদ্ধ। 'জানি। কিন্তু জানলেই আপনাকে বলব এমন মনে হলো কেন আপনার? অ্যাট এনি কস্ট, মক্কেলের গোপনীয়তা রক্ষা করা একজন উকিলের পবিত্র দায়িত্ব, জানেন না আপনি?'

'জানি।'

'তাহলে?' মাসুদ রানাকে চুপ থাকতে দেখে আবার বলে উঠলেন জেঙ্গার, 'ওসব দলিল সম্পর্কে আপনার ওপর কি নির্দেশ ছিল ড্যানিয়েলসের?'

'একটা সীলগালা করা খামে ছিল সব কাগজপত্র। ভদ্রলোক বলেছিলেন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর যেন খামটা আমি খুলি। ওর মধ্যে একটা চিঠি আছে আমার জন্যে, ওতে বিস্তারিত লেখা আছে ওগুলো নিয়ে কি করতে হবে আমাকে।'

'তো?' চোখ কুঁচকে পলকহীন দৃষ্টিতে দেখছেন ওকে প্রাক্তন কাউন্সেলর। 'খুলেছেন ওটা আপনি?'

কি বলবে ভাবছে মাসুদ রানা। একটা মিথ্যে বললে তাকে ঢাকতে আরও দশটা মিথ্যে বলতে হবে। সে ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে কিনা বুঝে উঠতে পারছে না।

'ওয়েল?'

'ওটা এখনও খোলার সুযোগ হয়নি, মিস্টার জেঙ্গার। তবে...'

'তবে নিউ ইয়র্ক থেকে নানটুকেট পর্যন্ত ছুটে আসার সুযোগ ঠিকই হয়েছে। সত্যি কথাটা কেন স্বীকার করছেন না যে ওগুলো হাতছাড়া হয়ে গেছে, ইয়াংম্যান? বলছেন না কেন যে ওসব পুড়ে গেছে, আগুন লেগেছিল আপনার অফিসে? বলেছি তো, নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ি আমি, টিভি দেখি! একটু আগে পর্যন্ত ওই অগ্নিকাণ্ডের বিষয়টাকে একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা জানতাম আমি। কিন্তু এখন বুঝলাম, সে ধারণা ভুল। ওই দলিলপত্রই অগ্নিকাণ্ডের কারণ। ভিক্টোরিয়া মরেছে, আপনার অফিস পুড়েছে, ওগুলো সব গেছে। ঘটনাগুলো একটার সঙ্গে আরেকটা যুক্ত, মিস্টার মাসুদ রানা। এই সামান্য বিষয়টা বুঝে... সে যাক। ওগুলো গেছে, ভাল হয়েছে। শাপে বর হয়েছে আপনার জন্যে, ইয়াংম্যান। আপনি জানেন না, স্যান্ডলার মানে বিপদ, স্যান্ডলার মানে মৃত্যু, স্যান্ডলার মানে বিষাক্ত কোবরা। ব্যাপারটা ভুলে যান, মিস্টার। আপনার ভাগ্য ভাল, বড় বাঁচা বেঁচে গেছেন আপনি। আমার মনে হয় ঈশ্বরের ইচ্ছে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকুন আপনি। তাই আগুনের ছলে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করেছেন তিনি আপনাকে। বুঝেছেন? ওসব ভুলে যান। একেবারে ভুলে যান।'

বৃদ্ধের সতর্ক বাণীগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করে দেখল মাসুদ রানা। বোঝা

গেল আর্থার সম্পর্কে ভালই জ্ঞান রাখেন বৃদ্ধ। মৃদু, অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলল ও, 'আগুনটা যদি না লাগত, তাহলে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র আগ্রহ জন্মাত না আমার, মিস্টার জেঙ্গার। নিজের ঝামেলা নিয়েই অস্থির আমি, এ নিয়ে মোটেই মাথা ঘামাতাম না। কিন্তু এখন ঘামাতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ আমার ধারণা, শুধু অফিসে আগুন লাগানোই নয়, আমাকে হত্যা করার চেষ্টাও নেয়া হয়েছিল ভিক্টোরিয়া যেদিন মারা যান, সেদিন রাতে।'

'কি বললেন?' গলা খাদে নেমে গেল অ্যাডলফ জেঙ্গারের।

'ঠিকই শুনেছেন। অল্পের জন্যে মিস করেছে হত্যাকারী।'

'মা-ই গড!' খানিক বিরতি। 'বুঝুন তাহলে!'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা 'বুঝি। কিন্তু এই বোঝায় সন্তুষ্ট নই আমি, মিস্টার জেঙ্গার। আরও পরিষ্কার করে বুঝতে হবে সব আমাকে।'

'দুঃখিত। আমি কোন সাহায্য করতে পারব না আপনাকে। এত কিছু জেনে-বুঝেও আপনি সতর্ক হচ্ছেন না, আশ্চর্য! আসলে স্যান্ডলারদের সম্পর্কে এত আগ্রহের কারণ কি আপনার, বলুন তো!'

'আমার জায়গায় আপনি হলে আগ্রহী হতেন না?'

'না!' দ্রুত কয়েকবার মাথা ঝাঁকালেন বৃদ্ধ। 'মোটেই না। আইন ব্যবসায়ে পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞ কেউ যদি আপনাকে যা বললাম, তার দশ ভাগের এক ভাগ আভাসও দিত আমাকে, সতর্ক হওয়ার তাগিদ অনুভব করতাম আমি অবশ্যই। নিজের পথ দেখতাম।'

'আমিও ঠিক তাই চাইছি।'

'বুঝলাম না।'

'একজনকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আমি। স্যান্ডলার পরিবারের সঙ্গে খুব সম্ভব সম্পর্ক আছে তার।'

নীরবে কিছু সময় ওকে পর্যবেক্ষণ করলেন বৃদ্ধ। 'কে সে?'

'একটা মেয়ে।'

'বুঝলাম। কিন্তু স্যান্ডলারদের সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?'

'ভাবছি আপনাকে বলব কি না।'

অবাক হলেন বৃদ্ধ। 'কেন? বলবেন না কেন?'

'আপনি তো কিছুই বলছেন না আমাকে।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন বৃদ্ধ। 'আচ্ছা, বেশ। আসুন তাহলে, কিছু তথ্য বিনিময় করি বরং আমরা। আপনি কিছু বলুন, আমি কিছু বলি। অল রাইট?'

'অল রাইট।' মনে মনে হাসল মাসুদ রানা।

'এবার বলুন মেয়েটি কে।'

'লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম,' বৃদ্ধের চোখে চোখ রেখে বলল ও। 'আর্থার স্যান্ডলারের মেয়ে বলে দাবি করছে সে নিজেকে।'

হাঁ হয়ে গেলেন জেঙ্গার ধীরে ধীরে। অনেকক্ষণ পর হাসির ভঙ্গি করলেন তিনি, কিন্তু মনে হলো যেন কাঁদছেন। 'ওহ্, ক্রাইস্ট!' ফ্যাস ফ্যাস করে বলে উঠলেন বৃদ্ধ। 'অসম্ভব! এ হতে পারে না।'

'কেন হতে পারে না?'

'বৈধ বা অবৈধ, কোন সন্তান নেই স্যান্ডলারের। আমি খুব ভাল করেই জানি। বিয়ে করেনি লোকটা।'

'কিন্তু মেয়েটি যে-সব প্রমাণপত্র হাজির করেছে, তা পরীক্ষা করে প্রভাবিত হয়েছি আমি, মিস্টার জেঙ্গার।'

ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগলেন বৃদ্ধ। চোখ বুজে আছে। 'হতে পারে না। কোনমতেই হতে পারে না। আর্থার স্যান্ডলার অন্য চরিত্রের ছিল। পথে-ঘাটে জারজ সন্তান জন্ম দেয়ার জন্যে নিজের ঔরস খরচ করে বেড়াবার মত মানুষ ছিল না সে কোন কালেই। অসম্ভব!'

'মেয়েটি অবৈধ নয়।'

'আর বলতে হবে না। বৈধ সন্তানের তো প্রশ্নই আসে না, কারণ বিয়েই করেনি লোকটা।'

'সম্ভবত করেছিল, আপনাদের অজান্তে। হতে পারে না?'

'কোথায়!' চোখ গরম করে তাকালেন জেঙ্গার। 'কখন?'

'ব্রিটেনে। ১৯৫৯ সালে। ভালবেসে এলিজাবেথ নামে এক মেয়েকে বিয়ে করে সে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরিচয় হয় দু'জনের, এক্সিটারে।'

মুহূর্তের জন্যে ওর মনে হলো, থতমত খেয়ে গেলেন যেন অ্যাডলফ জেঙ্গার সন্দেহের কালি ঘনীভূত হলো তাঁর বাদামী দুই চোখে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলেন তিনি। মৃদু হাসলেন। 'ইংল্যান্ডে পরিচয়, না? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়? একদম ডাহা মিথ্যে, মিস্টার রানা। শুধু ওই সময় কেন, জীবনে কোনদিন ওদেশে যায়নি আর্থার।'

'আপনি ঠিক জানেন?'

'অবশ্যই ঠিক জানি! যুদ্ধের সময় দেশত্যাগের কোন প্রশ্নই আসে না। কারণ স্যান্ডলাররা আসলে ছিল জার্মান, কেবল তিন পুরুষ ধরে আমেরিকান। সে সময়ে অভিবাসী জাপানী ও জার্মানদের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব ছিল খুবই কঠোর। যে-ই সে সময়ে এ দেশ ত্যাগ করেছে, সে যে দেশের উদ্দেশেই হোক, তাকে আর ঢুকতে দেয়া হয়নি। স্পাই বলে সন্দেহ করা হত তাদের। নাগরিকত্ব বাতিল করে দেয়া হত। এমন অনেক পরিচিত মানুষের কথা জানি আমি, যারা যুদ্ধের সময় এ দেশ ত্যাগ করে আর ফিরে আসতে পারেনি। এ দেশে রক্ত পানি করে গড়ে তোলা বাড়ি-গাড়ি, সম্পদ হারিয়ে পথের ভিখিরিতে পরিণত হয়েছে তারা প্রত্যেকে। ইউ সী, আর্থার স্যান্ডলার ছিল এ দেশের প্রথম সারির ধনীদের একজন। তার দ্বারা সে সময়ে দেশ ত্যাগ করা কি সম্ভব মনে করেন আপনি? গেলে কি আর ফিরে আসতে পারত সে? স্যান্ডলার এস্টেটে মালিকানা বহাল থাকত তার?'

কি যেন ভাবল মাসুদ রানা। 'সত্যি কি তাই?'

'আমি তো তাই মনে করি।'

'কিন্তু দুঃখিত। আমি করি না।'

'না করার কোন বিশেষ কারণ আছে কি?'

'আছে।'

'যেমন?'

'আগ্রহের বসে দু'য়েকটা টেলিফোন করার লোভ সামলাতে পারিনি আমি।'

'টেলিফোন! কোথায় করেছেন?' কপাল বিশ্রীরকম কুঁচকে উঠল জেঙ্গারের।

'ব্রিটেনে। এক্সিটারে।'

কপাল সমান হয়ে গেল তাঁর। শীতল গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কাকে? কেন?'

'আর্থার-এলিজাবেথের বিয়ে আর লেসলির বার্থ সার্টিফিকেট সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার জন্যে।'

'ফলাফল?'

'ইতিবাচক। আর্থারের এলিজাবেথকে লেখা কিছু চিঠি আমাকে দিয়েছে লেসলি, ওগুলোর হাতের লেখা ভেরিফাই করব ভাবছি। প্রয়োজনে ব্রিটেনেও যাব আমি, ওই বিয়ের দুই সাক্ষী আর বিয়ে যিনি পড়িয়েছেন, সেই প্যাসটরের খোঁজে।'

'হোলি ক্রাইস্ট!' প্রায় গুঙিয়ে উঠলেন অ্যাডলফ জেঙ্গার। চোখ কপালে তুলে চেয়ে আছেন মাসুদ রানার নিরুদ্বিগ্ন মুখের দিকে। 'হোলি, হোলি ক্রাইস্ট!!'

লোকটির প্রতিক্রিয়া দেখে মনে মনে বিস্মিত হলো রানা। মুখের সমস্ত রক্ত গড়িয়ে নেমে গেছে বৃদ্ধের, কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে চেহারা। চেয়ারের হাতলে পড়ে থাকা দু'হাত কাঁপছে মৃদু মৃদু। 'মাসুদ রানা, সাবধান! যদি প্রাণের মায়া থেকে থাকে, সাবধান হোন, প্লীজ!' মৃদু কাঁপা গলায় বলে চলেছেন জেঙ্গার। 'বোকামি করবেন না। সরে পড়ুন। জড়াবেন না এর সঙ্গে। কেউ প্রাণে বাঁচবে না, সবাই মরবে। সবাই মরবে!'

'সবাই কে?'

'আপনি!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সে। 'আমি! ওই মেয়েটি। ভুয়া বলে রেহাই পাবে না সে-ও।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল রানা। 'তাই যদি হয়, তাহলে আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে যা যা জানেন আপনি, সব বলতে হবে আমাকে। সব বলতে হবে। কোন কিছু গোপন করতে পারবেন না।'

ঋষির মত ধ্যানে বসলেন যেন অ্যাডলফ জেঙ্গার। মুখ ঘুরিয়ে নানটুকেট সাউণ্ডের দিকে চেয়ে থাকলেন একভাবে পলক পড়ছে না। রুগ্ন মানুষের মত অনিয়মিত ওঠানামা করছে বুক। নীরবতা পাথরের মত চেপে বসেছে ঘরের মধ্যে। 'সব শুনতেই হবে?' ফিস ফিস করে বললেন বৃদ্ধ এক সময়, যেন আর কেউ শুনে ফেলার ভয় আছে।

'হ্যাঁ। প্রথম কারণ, আমাকে হত্যা করার চেষ্টা নেয়া হয়েছে, আমার অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়েছে। এবং দ্বিতীয় কারণ, এখন আমি বুঝতে পারছি কেন ওই পরিবারের দলিলপত্র আমাকে দিয়ে গেছেন ড্যানিয়েলস। কেন বলে গেছেন, ভিক্টোরিয়া স্যান্ডলারের মৃত্যুর পর প্যাকেটটা খুলতে।'

'কেন!'

'তিনি জানতেন, স্যান্ডলার সম্পত্তির আরেকজন উত্তরাধি-কারিণী আছে ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর সে যাতে তার ন্যায্য পাওনা বুঝে পায়, সেই জন্যে।'

'তাই যদি হয়, সে বেঁচে থাকতেই বা কেন আসেনি মেয়েটি? কে বাধা দিয়েছিল তাকে?'

'এর উত্তর আশা করছি আপনার কাছে পাব আমি। ওই প্যাকেটে ড্যানিয়েলসের আপনাকে লেখা একটা চিঠিও ছিল। তিনি মুখে বলে গেছেন, সময় মত প্রয়োজন হলে যেন আপনার সঙ্গে দেখা করি আমি। সো,' কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'বুঝতেই পারছেন!'

'না, পারছি না। সত্যিই পারছি না। আমি যেমন জানি, ড্যানিয়েলসও তেমনি জানত আর্থারের কোন সন্তান নেই। ভিক্টোরিয়াই ছিল ওই পরিবারের শেষ ওয়ারিশ আমার চেয়ে বরং বেশি জানত সে ওদের সম্পর্কে। তারপরও কেন...'

নীরবে বৃদ্ধকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকল রানা।

'ঠিক আছে,' একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন জেঙ্গার। 'যা জানি আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে সব বলছি আমি। কিন্তু তার আগে কথা দিন, এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর এ নিয়ে আর খোঁচাখুঁচি করবেন না আপনি ভুলে যাবেন বিষয়টা।'

মাথা দোলাল ও। 'দুঃখিত। সব না শোনা পর্যন্ত কোন প্রতিজ্ঞা করতে পারব না আমি।'

হতাশ হলেন যেন বৃদ্ধ। 'গড হেলপ ইউ, ইয়াংম্যান! গড হেলপ ইউ!'

দরজায় এসে দাঁড়াল অ্যাপ্রন পরা বৃদ্ধা। 'আপনাদের লাঞ্চ তৈরি, স্যার।'

'চলুন,' রানার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল জেঙ্গার 'খিদে পেয়েছে খুব রানাকে ইতস্তত করতে দেখে বলল, 'আপনি আসছেন জেনে আজ দু'জনের লাঞ্চ তৈরি করেছে মিসেস ক্ল্যানসি। আসুন, সঙ্কোচের কিছু নেই।'

'সব কিছুতেই অসাধারণ ছিল আর্থার স্যান্ডলার। কথাটা স্মরণ রাখবেন, জিনিয়াস ছিল সে একটা। শুধু অসাধারণ না, আরও কিছু বেশি ছিল আর্থার।'

খাওয়ার পাট চুকিয়ে সীটিং রুমে ফিরে এসেছে রানা ও অ্যাডলফ জেঙ্গার। আগের মত বসেছে মুখোমুখি। পায়ে শীত লাগছে, তাই দুই উরুর ওপর একটা ছোট আফগান কম্বল মেলে রেখেছেন বৃদ্ধ।

বলে চলেছেন তিনি, 'তার মত চতুর, ধূর্ত, হারামজাদা জীবনে দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। জিনিয়াস ছিল সে অসাধারণ জিনিয়াস।'

'কোন লাইনের জিনিয়াস?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'বিশেষ কোন লাইনের না, সব লাইনের সব বড় বড় দাঁও মারত, ব্যবসার কথা বোঝাচ্ছি আমি কেমিক্যালস, ফিনান্স আর এনগ্রেভিঙের প্রতি আগ্রহ ছিল তার প্রচণ্ড। তিনটি ক্ষেত্রেই প্রায় বিপ্লবী জিনিয়াস ছিল আর্থার স্যান্ডলার।'

১৮৫০ সালে আর্থার ও ভিক্টোরিয়ার দাদা, ভিলহেলম ফন ড্রেইসেন স্যান্ডলার ভাগ্যের খোঁজে জার্মানি ত্যাগ করে নিউ ইয়র্ক আসেন হামবুর্গ ছিল তার জন্মস্থান। এদেশে এসেই ফ্যাব্রিক্সের ব্যবসা শুরু করেন ড্রেইসেন। ইউরোপ থেকে আমদানী করে আমেরিকান পাইকারদের কাছে বিক্রি করতেন তিনি ফ্যাব্রিক্স, পাঁচশো পার্সেন্ট মার্ক আপে। কিছুদিনের মধ্যেই বিস্তর পয়সার মালিক হয়ে যান ভদ্রলোক।

নিউ ইয়র্ক শহর তখন ক্রমেই বিস্তার লাভ করছে। মানুষ বাড়ছে, দালান-কোঠা বাড়ছে সুযোগের জন্যে অপেক্ষাকারীদের দলে নয়, ড্রেইসেন পড়েন সুযোগ সৃষ্টি করে নেয় যারা, তাদের দলে। বুঝে ফেললেন, ফেব্রিক্সের থেকেও অনেক বড় ব্যবসা তাঁর আশেপাশেই আছে। শহরের যেখানেই জমি বিক্রির খবর হয়, সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হতে লাগলেন ড্রেইসেন। চোখ-কান বুজে জমি, বিল্ডিং কিনতে থাকেন। হাড় কিপটের মত জীবন ধারণ করতেন তিনি সে সময়ে।

মাত্র দশ বছরে মার্কিন মিলিয়নেয়ারদের মাঝে স্থান করে নেন ড্রেইসেন স্যান্ডলার। জীবনে দু'বার প্রেমে পড়েন তিনি, একবার এক নারীর, আরেকবার এক বিল্ডিঙের। ১৮৬৪ সালে বিয়ে হয় তার সুন্দরী এক মার্কিন মেয়ের সঙ্গে। নববধূকে নিয়ে হানিমুনে যান ভদ্রলোক ইউরোপের কয়েকটি দেশে। ফ্রান্সে বেড়ানোর সময় ওদের এক বিশাল শ্যাতো খুব পছন্দ হয় তাঁর, রীতিমত ওটার প্রেমে পড়ে যান ভদ্রলোক।

খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ১৭৩০ সালে নির্মিত শ্যাতোটির বর্তমান মালিক ব্যারন আলেক্সেই ডি আর্টেনিস। তাঁর দাদার তৈরি এই শ্যাতো। যেচে পড়ে ব্যারনের আমন্ত্রণ আদায় করলেন ড্রেইসেন স্যান্ডলার, সস্ত্রীক ঘুরে দেখলেন ভেতরটা। দেখে মাথা খারাপ হওয়ার দশা। পরে দূত মারফত শ্যাতোটা কেনার প্রস্তাব পাঠালেন তিনি। ব্যারন অপমানিত হলেন, কোন জবাবই দিলেন না। আঁতে ঘা লাগল ড্রেইসেন স্যাণ্ডলারের। ফিরে এলেন তিনি নিউ ইয়র্ক।

ম্যানহাটন তখন ছিল শহরতলি, প্রায় গ্রামই বলা চলে। এর বর্তমান এইটি নাইনথ স্ট্রীটে বেশ বড় একটা প্লট ছিল তাঁর। প্রকাণ্ড সব পাইন-আখরোট ইত্যাদির ছায়াঢাকা প্লট। সেখানে নিজের শ্যাতো তৈরি করলেন ড্রেইসেন, অবিকল আর্টেনিসের শ্যাতোর মত করে। ১৮৭৭ সালে শেষ হয় ওটার নির্মাণ কাজ। এইটি নাইনথ স্ট্রীটের ব্যারন বনে যান ভিলহেলম ফন ড্রেইসেন স্যান্ডলার। ১৮৮০ সালে হার্ট ফেইলিওরে মৃত্যু হয় তাঁর।

দুই ছেলে এক মেয়ে ছিল তাঁর। বড় ছেলে সৈনিক, অবিবাহিত। ১৮৯৮ সালের উনিশ দিনের আমেরিকা-স্পেন যুদ্ধে মারা যান তিনি। দ্বিতীয়টি মেয়ে, থেরেসিয়া। বিকট চেহারা ছিল মহিলার, নিউ ইয়র্কে সবচেয়ে কুৎসিত ছিলেন তিনি। মুখমণ্ডল ছিল প্রায় ঘোড়ার মত। পয়সাওয়ালার মেয়ে হলেও কেউ তাঁকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসেনি। ১৯৩২ সালে মৃত্যু হয় থেরেসিয়ার।

শেষেরজন ছিল ছেলে, জোসেফ। তাঁরই সন্তান ভিক্টোরিয়া ও আর্থার প্রথমজনের জন্ম ১৯১০, দ্বিতীয়জন, অর্থাৎ আর্থারের ১৯১৬ সালে। প্রথমটি আধা মানসিক প্রতিবন্ধী ছিল। আর্থার স্যান্ডলার? সে ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষ। শঠ, ধূর্ত, চতুর, সান অভ আ বিচ ধরনের। দাদার রেখে যাওয়া সম্পদ খুব একটা বাড়াতে পারেননি জোসেফ, তাই স্যাণ্ডলারদের অর্থ সঙ্কট দেখা দেয় ১৯৩৫ সালের শেষ দিকে। অতএব কাজে নেমে পড়ল আর্থার।

'কি কাজ?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'কেমিক্যালস আমদানী। ছোটবেলা থেকেই কেমিস্ট্রির প্রতি ঝোঁক ছিল তার

খুব। বিশ বছর বয়সে এ ক্ষেত্রে জিনিয়াস হয়ে ওঠে আর্থার। ইউরোপ থেকে নানান কেমিক্যালস আমদানী করতে শুরু করে সে। দাদার মতই কয়েকশো পার্সেন্ট করে মুনাফা অর্জন করতে থাকে আর্থার প্রতিটি আইটেমে। ইউরোপের কোন কোন দেশ থেকে আমদানী করছিল জানতে চাইবেন না যেন।'

মাথা দোলাল রানা। 'ঠিক আছে। কোন কোন দেশ থেকে?'

মৃদু হাসি ফুটল জেঙ্গারের মুখে 'স্পেন, ইটালি, জার্মানি, পর্তুগাল।'

'সবগুলো ফ্যাসিস্ট শাসিত দেশ,' মৃদু কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। বাইরে পড়ন্ত সূর্যের আলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে ঢাকা পড়ে গেল মেঘে। আবছা আঁধার হয়ে গেল বসার ঘর।

'আমেরিকা কোন আপত্তি তোলেনি তা নিয়ে, কারণ সরকার ফ্যাসিস্ট হলেও ওদের কেমিক্যালস ফ্যাসিস্ট ছিল না! ওগুলো আমেরিকানদের খুব প্রয়োজনে লেগেছে তখন। মাত্র কয়েক বছরে দাদার দশগুণ টাকা বানিয়ে ফেলল আর্থার স্যান্ডলার এই সময়, হঠাৎ করেই তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে ফেডারেল সরকার। অভিযোগ তোলা হয়, লক্ষ করুন, অভিযোগ তোলা হয় যে আর্থার স্যান্ডলার, ইটালিয়ান লিরার আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির সাথে যে ভাবেই হোক, জড়িত। এটা অবশ্য ঠিক, যখনকার কথা, তখন বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল লিরার দাম।

'১৯৩৯ সালে কারেন্সি ম্যানিপুলেশনের ব্যাপারে তাকে সরাসরি অভিযুক্ত করে মার্কিন সরকার, মারাত্মক ধরনের মামলায় ফেঁসে যায় আর্থার স্যান্ডলার কয়েকটা ফ্রড চার্জ, একটা-দুটো নয়। মরীয়া হয়ে অবশ্যম্ভাবী জেল এড়ানোর জন্যে আইনের ফাঁক-ফোকর খুঁজতে থাকে সে, কিন্তু স্যান্ডলার পরিবারের তখনকার আইন-জীবীরা এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়।

'আর্থারও লাগে উঠে-পড়ে। জেলে যাবে না সে। ওই দণ্ড ঠেকাতেই হবে। এবং শুধু ঠেকালেই চলবে না, মামলায় তাকে বিজয়ী করে দিতে হবে, তেমন এক যোগ্য উকিল চাই তার। ওয়েল,' হাসি ফুটল জেঙ্গারের মুখে। 'অবশেষে খুঁজে পেল সে তেমন এক উকিল। কয়েক মাস পর কোর্টে উঠল আর্থারের মামলা জিতে গেল সে। এক মামলা ছিল বটে সেটা। ওফ্! ভাবলে এখনও গায়ে কাঁটা দেয় আমার। একের পর এক অকাট্য যুক্তি, তথ্য প্রমাণ ইত্যাদি দেখিয়ে সরকারি উকিলকে প্রায় মেঝেতে শুইয়ে ফেলেছিল আর্থারের উকিল।'

'ড্যানিয়েলস?'

'অফকোর্স ড্যানিয়েলস! সে ছাড়া আর কে হতে পারে?'

'তারপর?'

'পরের বছর, ১৯৪০ সাল। ইউরোপের প্রায় দেশই জড়িয়ে পড়েছে যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রও জড়িয়ে যায়-যায় অবস্থা. এই সময় আবার স্যান্ডলারের বিরুদ্ধে নতুন তিনটে অভিযোগ তোলে ফেডারেল সরকার। সবগুলো কারেন্সি ফ্রড কেস। তবে এবার সরকার কেসগুলো কোর্টে তুলতে আগ্রহ বোধ করল না। নভেম্বর মাসে. এক সকালে অফিসে রওনা হলো আর্থার। তার অফিস ছিল লোয়ার ম্যানহাটনে অফিস বিল্ডিঙের সামনে এসে থামল তার গাড়ি।

'গাড়ি থেকে নেমে সবে দু'পা এগিয়েছে সে, এমন সময় সিভিল ড্রেস পর

চার এফ.বি.আই ঘিরে ধরল তাকে। দু'জন দু'দিক থেকে আর্থারের কোটের আস্তিন টেনে ধরল। ঘটনা দেখে থমকে গেল পথচারীরা, তাকিয়ে থাকল অবাক চোখে। থতমত খেয়ে গেল আর্থার স্যান্ডলার। তৃতীয় এজেন্ট, গণ্ডারের মত স্বাস্থ্য লোকটার, এগিয়ে এসে তার কোটের ল্যাপেল দু'হাতে মুঠো করে ধরে শূন্যে তুলে ফেলল আর্থারকে। ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিল তাদের গাড়ি, একটা ১৯৩৯ মডেলের প্যাকার্ড, ওটার পিছনের জানালার ওপর দড়াম করে আছড়ে ফেলল তাকে লোকটা।

'এত জোরে ফেলল যে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল জানালার কাঁচ। ভয় পেয়ে গেল আর্থার স্যান্ডলার, মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেল তার। হাত থেকে কখন ব্রিফকেসটা খসে গেছে টেরই পায়নি। চার নম্বর এফ.বি.আই দরজা খুলে দিল প্যাকার্ডের, ভেতরে ছুঁড়ে ফেলা হলো আর্থারকে। দু'জন বসল তার দু'পাশে, বাকি দু'জন সামনে। মুহূর্তে হাওয়া হয়ে গেল প্যাকার্ড। পথচারী, মানে ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শীরা হাঁ করে চেয়ে থাকল ওটার গমনপথের দিকে। আর্থারকে তারা অনেকেই চেনে। তাকে কারা ধরে নিয়ে গেল তাই নিয়ে গবেষণায় মেতে উঠল সবাই।

'ওদিকে প্রমাদ গুনল অজানা শত্রু পরিবেষ্টিত আর্থার স্যান্ডলার। এরা কারা জানে না সে। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে সে ব্যাপারেও কোন ধারণা নেই। জিজ্ঞেস করবে কিনা ব্যাপারটা ভাবছে সে, এই সময় তাকে সতর্ক করে দিল বিশালদেহী এজেন্ট, "মুখ খুললে বিপদ হবে।" অতএব চুপ করেই থাকল আর্থার স্যান্ডলার। এফ.বি.আই-এর হেড অফিস, ডুয়েন স্ট্রীটের দিকে গেল না প্যাকার্ড, সোজা কার্ডিনাল হেইস প্লেসের ইউ.এস. কোর্টহাউসে গিয়ে ঢুকল। গাড়ি থেকে নামিয়ে এলিভেটরে করে নিয়ে আসা হলো তাকে ছয়তলায়। একটা বড় ঘরে ঢোকানো হলো।

'ভিতরে বিশাল এক স্টীলের ডেস্কের পিছনে বসা দেখল আর্থার লালমুখো একজনকে। লোকটা চেইন স্মোকার; নাম আর্চিবল্ড ম্যাকফেড্রিস "আমার ধারণা, আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেয়া উচিত," বলল লোকটা আর্থারকে "কারণ আমি তোমাকে তোমার অ্যাটর্নিকে ফোন করার ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছি।"

'হাঁ করে তাকিয়ে থাকল আর্থার স্যান্ডলার। ঘরের আরেকজনের ওপর চোখ পড়েছে তার। এক কোণে চুপ করে বসে আছে লোকটা। এদিকে তাকাচ্ছে না। তার নাম উইলিয়াম ওয়ার্ড ড্যানিয়েলস—তারই পারিবারিক অ্যাটর্নি। নার্ভাস বোধ করল আর্থার, ওই লোক এখানে কেন? অমন চুপচাপ কেন বসে আছে সে? ম্যাকফেড্রিসের দিকে তাকাল আবার আর্থার স্যান্ডলার। এইবার তার চোখে পড়ল, লোকটার সামনে চারটে ডোশিয়ে আছে, একটার ওপর আরেকটা সাজানো

' "ড্যানিয়েলস!" খ্যাঁক করে উঠল লালমুখো। "ওকে বলো, কেন এখানে নিয়ে আসা হয়েছে ওকে।"

'বলল ড্যানিয়েলস। এটা ইউ.এস. স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট অ্যাটর্নির অফিস অ্যাটর্নি স্বয়ং অর্গানাইজড ক্রাইম ও র‍্যাকেট কেসগুলো ডীল করেন, আর অ্যাসিসটেন্ট অ্যাটর্নি, আর্চিবল্ড ম্যাকফেড্রিস পরিচালনা করেন অন্য কিছু—এসপিওনাজ। তাঁর জানামতে বেশ কিছু জাপানী ও জার্মান স্পাই আছে নিউ ইয়র্ক

ও ওয়াশিংটনে। তথ্য চালাচালি করে ওরা। তাদের চিহ্নিত করা গেছে, কিন্তু তাদের র‍্যাকেটে ইনফিলট্রেট করা যাচ্ছে না—র‍্যাকেটের উঁচু পর্যায়ে আর কি।

'আর্থার স্যান্ডলার যে লেভেলের মানুষ, সে যদি ইচ্ছে করে খুব সহজেই এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে সে মার্কিন সরকারকে। আফটার অল সে আমেরিকার প্রথম শ্রেণীর মর্যাদাসম্পন্ন এক নাগরিক। আমেরিকার শত্রু নিধনে আর্থার যদি এই সামান্য সহযোগিতা করে, মার্কিন জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকবে তার কাছে।

'অভাবনীয় প্রস্তাবটা শুনে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল আর্থার স্যাণ্ডলারের। আক্ষরিক অর্থেই হাঁ করে চেয়ে থাকল সে ড্যানিয়েলসের দিকে। কিন্তু তার দিকে চেয়ে নেই তখন আইনজীবী। বক্তব্য শেষ করেই মুখ নামিয়ে নিয়েছে সে, যেন লজ্জা পাচ্ছে।

' "এগুলো কি জানেন আপনি?" ইঙ্গিতে ডোশিয়েগুলো আর্থারকে দেখাল ম্যাকফেড্রিস। "জানেন?" দুম করে প্রচণ্ড এক ঘুসি বসাল সে ডোশিয়েগুলোর ওপর।

'কথা বলল না আর্থার। বসে থাকল মূর্তির মত।'

' "আপনার বিরুদ্ধে তিন-তিনটা কারেন্সি ভায়োলেশন কেস, স্যান্ডলার!" খুব যেন তৃপ্তি পাচ্ছে, এমন মুখভঙ্গি করল আর্চিবল্ড। "এবং একটা অ্যাডিশনাল রাষ্ট্রদ্রোহিতার কেস।"

'চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল আর্থারের। ঘন ঘন নিজের আইনজীবী ও ম্যাকফেড্রিসকে দেখছে সে। বুঝে উঠতে পারছে না কি বলবে, বা কি করবে।

' "জার্মানির সঙ্গে ট্রেডিং ১৯৩৮ সালেই বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছে, স্যান্ডলার," চুরুটের ঘন ধোঁয়ার মেঘের আড়াল থেকে বলল ম্যাকফেড্রিস। "কোনও এক সুইস কর্পোরেশনের মাধ্যমে জার্মানির সঙ্গে ব্যবসা করেছেন বলে ভেবে বসবেন না যে পার পেয়ে যাবেন আপনি।"

' "অসম্ভব!" ফিস ফিস করে যেন নিজেকেই শোনাল আর্থার। "আপনাদের একটা মামলাও ধোপে টিকবে না।"

' "তাই ভাবছেন?" মুখ বেঁকে গেল চুরুটখেকোর। "আমরা এ-ও জানি, আপনার অ্যাটর্নি বন্ধু কি উপায়ে আপনার বিরুদ্ধে আনীত প্রথম ফ্রড কেস থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন আপনাকে।"

'ড্যানিয়েলসের দিকে তাকাল স্যাণ্ডলার।

' "হ্যাঁ," মুখ কালো করে বলল অ্যাটর্নি। "এরা জেনে গেছে ওই কেসে আমি জুরি ট্যাম্পার করেছি।"

' "আপনারা যখন জুরি ট্যাম্পার করতে পারেন, আমরাও পারি," বলল ম্যাকফেড্রিস "ইচ্ছে করলেই বছর ত্রিশেক জেলের ভাত খাওয়াতে পারি আপনাকে, স্যান্ডলার। চল্লিশ বছরও সম্ভব। আর আপনার চোপা-সর্বস্ব অ্যাটর্নি বন্ধু, এর জন্যেও অন্তত দশ বছরের আয়োজন করতে পারি। ফল কি হবে তাতে? সব খোয়াবেন আপনি, জমি-জমা, ব্যাংক ব্যালান্স, সব। আধ-পাগল বোনটা ভাইয়ের শোকে মরবে ভেবে দেখুন।"

'ড্যানিয়েলসের দিকে ফিরল আবার আর্থার।

' "এরা নেগোশিয়েট করতে চায়," নিচু গলায় বলল অ্যাটর্নি। "আমার মনে হয় আপনার রাজি হয়ে যাওয়াই ভাল।"

' "কি করতে হবে আমাকে?"

' "জার্মানিকে অনেকের চেয়ে ভাল চেনেন আপনি," বলল চেইন স্মোকার। "জার্মান বলতে পারেন অনর্গল। ওদের সমাজ, ব্যবসা-বাণিজ্য এমনকি মিলিটারির উঁচু পদের অফিসারদের সঙ্গেও সহজেই সখ্যতা গড়ে তুলতে পারবেন। এদেশে যেসব জার্মান স্পাই আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন। ওরা জানে আপনি কে; আপনি ওদের হয়ে ওদের সাহায্য করার ভান করবেন। যদি আমরা ইউরোপের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি, জার্মানি পালিয়ে যাবেন আপনি। যুদ্ধের সময়টা থাকবেন ও দেশে, আমাদের তথ্য সরবরাহ করবেন। যুদ্ধ শেষ হলে ফিরে আসবেন, আপনার যাবতীয় সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া হবে আপনাকে। প্লাস, আপনার সহযোগিতার বিনিময়ে যখন প্রয়োজন হবে, আঙ্কেল স্যামও সাহায্য করবে আপনাকে একবার কি দু'বার।"

'ঝাড়া দুই মিনিট লালমুখোর দিকে তাকিয়ে থাকল স্যান্ডলার। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বলল, "ইউ বাস্টার্ডস!" '

'তাহলে?' আপনমনে বলল মাসুদ রানা। জুরি ট্যাম্পারিঙের মাধ্যমে আর্থারকে জিতিয়েছিলেন ড্যানিয়েলস?'

'অবশ্যই!'

'আর্থার স্যান্ডলার কি করল তারপর?'

'শুরু করে দিল স্পাইং। মাত্র এক বছরের মধ্যে প্রমাণ করে দিল সে কত বড় এক জিনিয়াস। ১৯৪১ সালের নভেম্বরে সে নিজেকে নিউ ইয়র্ক জার্মান স্পাই নেটওয়র্কের দু'নম্বর ব্যক্তিত্বে পরিণত করল। তারপর লাগল এক নম্বর হওয়ার প্রচেষ্টায়। এক নম্বর ছিল কার্ল হানসিকার। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকত লোকটা সব সময় রোজ দু'বার গোসল করত। একদিন তার বাসায় গেল স্যান্ডলার, হানসিকারের সঙ্গে "গোপন পরামর্শ" করতে। সে রাতেই নিজের বাথটাবে মারা গেল এক নম্বর। টাবের পানি গরম করার হিটারের তার-টার কি করে রেখে এসেছিল স্যান্ডলার কে জানে! গোসল করতে নেমেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেল কার্ল হানসিকার

'এক নম্বর এজেন্ট বনে গেল স্যান্ডলার এরপর। ১৯৪২ সালে তাকে এবং আরও কয়েক শত্রুদেশের জার্মান এজেন্টকে "স্বদেশে" ডেকে পাঠাল বার্লিন। মেক্সিকো থেকে সাবমেরিনে চড়ে চলে গেল সে "স্বদেশে"।'

'কি করল সে জার্মানিতে?'

'জানি না। এই সব সাবমেরিন, বড় আজব জিনিস। এই সাউণ্ডে,' মুখ ঘুরিয়ে সাগর দেখালেন জেঙ্গার 'ঘুর ঘুর করত ওরা। জার্মানরা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। সে সময়ে অনেক দিন পর্যন্ত এই এলাকা কর্ডন করে রেখেছিল ওদের ইউ-বোট দিয়ে।'

'ভিক্টোরিয়ার কি হলো?'

'সে একাই পড়ে রইল স্যান্ডলার ম্যানসনে।'

'এস্টেটের খরচ চলত কি ভাবে? এত টাকা আসত কোত্থেকে? ওদের অ্যাকাউন্ট নিশ্চয়ই ভিক্টোরিয়া পরিচালনা করতেন না?'

'কোন টাকাই ছিল না ওদের। খরচ চালাতাম আমরা দু'জন, আমি আর ড্যানিয়েলস। সমস্ত খরচ।'

'টাকা ছিল না মানে?' তাজ্জব হয়ে গেল মাসুদ রানা। 'তখন না বললেন...'

'হ্যাঁ, মনে আছে কি বলেছি। তবে আর্থারের অ্যাকাউন্ট তখন সত্যিই প্রায় শূন্য ছিল। শুনেছি জমির খাজনা দিতে দিতে ফোকলা হয়ে গিয়েছিল আর্থার। সে যত রোজগার করে, সব খেয়ে ফেলে রিয়েল-এস্টেট অ্যাসেসমেন্ট অথরিটি। অবশ্য যুদ্ধের পরে যখন দেশে ফিরে আসে আর্থার স্যান্ডলার, তখন মনে হয় এক জাহাজ ডলার নিয়ে আসে সে সঙ্গে করে। ডলার প্রায় উপচে পড়ছিল তার অ্যাকাউন্ট থেকে।'

'কে দিল তাকে এত টাকা! মার্কিন সরকার?'

'সঠিক জানি না। তবে শুনেছি যুদ্ধের সময় কোন অজ্ঞাত সূত্র থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার উপার্জন করে সে। আসল ব্যাপারটা ড্যানিয়েলস জানত। কিন্তু আমাকে কিছু বলেনি কখনও।'

আনমনে গালে হাত বোলাতে লাগল মাসুদ রানা। উঠে পায়ে পায়ে জানালার কাছে গিয়ে সাগর দেখতে লাগল। আর কি কি প্রশ্ন বাকি আছে, ভাবছে। '১৯৬৪ সালে যা'কে রাস্তায় হত্যা করা হলো, সে আসলে কে? স্যান্ডলার নয় নিশ্চই?'

চেহারা করুণ করে মাথা দোলালেন অ্যাডলফ জেঙ্গার, যেন দুঃখ পেয়েছেন খুব। 'না। আর্থারের "ডবল" ছিল লোকটা। ওই বছরের মাঝামাঝি সময়ে কি ভাবে যেন ফাঁস হয়ে যায় যে, যুদ্ধের সময় অস্ট্রিয়ায় বড় ধরনের এক স্যাবোটাজ ঘটিয়েছিল আর্থার স্যান্ডলার, যার ফলে মিত্র বাহিনীর হাতে চরম মার খেতে হয় একবার অক্ষ বাহিনীকে এ খবর জানাজানি হয়ে গেলে বার্লিনের নির্দেশে উত্তর আমেরিকা থেকে কয়েকজন জার্মান স্পাই নিউ ইয়র্ক আসে আর্থারকে হত্যা করার জন্যে। দু'বার তারা খুব অল্পের জন্যে ব্যর্থ হয় আর্থারের সতর্কতার কারণে। ব্যাপার টের পেয়ে আর্থার ম্যাকফেড্রিসের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। ওয়াদা অনুযায়ী সাহায্য করে সে। অবিকল আর্থারের মতই দেখতে আরেকজনকে স্থাপন করা হয় তার জায়গায়, আর আর্থার চলে যায় অসলো। তারপর একদিন রাস্তায় আর্থার ভেবে তার "ডবল"কে হত্যা করে জার্মান স্পাইরা। অসলোয় কয়েক মাস কাটিয়ে ফিরে আসে আর্থার স্যান্ডলার, নতুন নাম-পরিচয়, এবং নতুন চেহারা নিয়ে। প্লাস্টিক সার্জারি করিয়ে নিজেকে আমূল বদলে ফেলেছিল আর্থার স্যান্ডলার।'

'লোকটা বেঁচে আছে এখনও?' ফিরে এসে বসল রানা।

শীতল চোখে তাকালেন প্রাক্তন কাউন্সেলর। 'আপনার অফিসে আগুন এমনি এমনি লেগেছে বলে ভাবছেন আপনি?' কয়েক মুহূর্ত রানাকে দেখলেন তিনি। 'লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম কে আমি জানি না, মিস্টার রানা। তবে এটুকু জানি, সে যা

দাবি করছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যে। তাকে সিরিয়াসলি নিলে মারাত্মক ভুল করবেন আপনি। আর যতই চেষ্টা করুন, বহু বছর আগে যে মানুষ "অফিশিয়ালি" মরে গেছে, সে বেঁচে আছে এমনটা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না কিছুতেই।'

'চেষ্টা করলে হয়তো পারব,' চিন্তিত গলায় বলল মাসুদ রানা।

'বোকার মত কথা বলছেন আপনি, মাসুদ রানা!' খেপে উঠলেন বৃদ্ধ। 'ইচ্ছে করেই মরণ ডেকে আনছেন নিজের! আপনি কি ভেবেছেন, এত বছর পর আপনি আর কোথাকার কোন এক মেয়ে মিলে "মৃত" আর্থারকে "বাঁচিয়ে" তোলার চেষ্টা করবেন, আর সে বসে বসে দেখবে? নিজের নতুন পরিচয় ফাঁস হওয়ার ঝুঁকি নেবে?' ;

'কি করে ঠেকাবে সে আমাকে?'

'শুনুন তাহলে। এ ঘটনা ড্যানিয়েলসের মুখে শুনেছি আমি। নতুন পরিচয়, চেহারা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসার পর সরকারের খুব উঁচু এক পদে যোগ দেয় সে। খুব উঁচু পদ। খুবই উঁচু, বুঝতে পারছেন? এতই উঁচুতে যে সারা দেশে মাত্র দু'জন জানত সে কে, কি তার আসল পরিচয়। জানত। বুঝলেন, সাহেব? জানত। তারা দু'জনেই খুন হয়ে গেছে যার যার বাড়িতে, একই রাতে। আর্থার দেশে ফেরার সাতদিনের মধ্যে। দু'জনকেই প্রায় জবাই অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

'প্রায়?'

'হ্যাঁ। পিয়ানো তারের ফাঁস গলায় পেঁচিয়ে হত্যা করা হয়েছে তাদের

'কি বললেন?'

'ঠিকই শুনেছেন। জুতোর হিলের গোপন কুঠুরিতে ওই অস্ত্র নিয়ে প্রেতের মত নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায় আর্থার স্যান্ডলার। ফুট দেড়েক চিকন পিয়ানোর তার, দুটো পিতলের আংটায় জোড়া সে তারের দুই প্রান্ত। ওটা তার প্রিয় অস্ত্র। অবশ্য মানুষ হত্যার আরও বহু কায়দা জানা আছে আর্থারের। বহু কায়দা। এত কায়দা, আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না হয়তো।'

মাসুদ রানাকে নীরবে হাসতে দেখে চোখ কোঁচকালেন অ্যাডলফ জেঙ্গার। 'কি ব্যাপার? হাসির কিছু বলেছি নাকি আমি?'

'না। তবে এইমাত্র আপনি প্রমাণ করলেন লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম জেনুইন। অন্তত উল্টোটা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সে জেনুইনই থাকবে আমার কাছে। দুঃখিত, কাউন্সেলর। আপনার অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।'

'কি বলতে চান?' থমথমে কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন বৃদ্ধ।

'অসহায় মেয়েটিকে সাহায্য করা ছাড়া কোন উপায় দেখছি না আমি সামনে।'

## ছয়

নিউ ইয়র্ক ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলতে একটা সাদা খাম চোখে পড়ল মাসুদ রানার, পড়ে আছে মেঝেতে। ট্রাভেল ব্যাগ রেখে ওটা তুলল রানা। ছিঁড়ে ফেলল এক প্রান্ত। ভেতর থেকে বেরোল একটা হলুদ

টিকেট- ম্যাডিসন স্কয়্যার গার্ডেনে আগামী পরশুর রেঞ্জার্স বনাম বোস্টন ব্রুইনস-এর মধ্যেকার আইস হকি ফাইনাল খেলার। একটা চিরকুটও আছে সাথে। ওতে লেখা

*প্রিয় মাসুদ রানা,*

*ওখানে থাকবেন দয়া করে। আমি আসব।*
*লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম*

টিকেটটা ওয়ালেটে রেখে দিল রানা। কিচেনে এসে কফির পানি চড়িয়ে অ্যাডলফ জেঙ্গারের কথা ভাবতে লাগল। আর্থার স্যাভলার সম্পর্কে ভাবতে লাগল। পরদিন সকালে হাঁটতে হাঁটতে থার্ড অ্যাভিনিউ এল রানা, নাইনটিনথ প্রিসিঙ্কট ভবনে মার্ক রাইডারের হত্যার তদন্তভার কার ওপর পড়েছে জেনে নিয়ে নক করল ডিটেকটিভ অ্যারাম সাশাদের বন্ধ কাঁচের দরজায়।

'কাম ইন!' মুখ তুলে রানাকে দেখল সাশাদ, তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে ভেতরে আসার ইঙ্গিত করল।

'আমি মাসুদ রানা,' ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল ও। 'থাকি দু'শো ছেচল্লিশ, সেভেনটি থার্ড স্ট্রীট। সিক্সথ ফ্লোর।'

এক মুহূর্ত সময় লাগল সাশাদের আগন্তুকের উল্লেখ করা নম্বর এবং স্ট্রীটের অবস্থান অনুধাবন করতে। 'বসুন, প্লীজ!' ডান দিকে বসা তার সহকর্মীকে দেখাল সে ইঙ্গিতে। 'প্যাটি হেরেন। ডিক। আমরা দু'জনে তদন্ত করছি আপনার বাসার সামনের মার্ডার কেস।'

হাত মেলাল রানা হেরেনের সঙ্গে। তারপর বসল। 'আপনি এসে ভালই করেছেন,' বলল সাশাদ। 'এইমাত্র আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ওই বিল্ডিঙের সবার সঙ্গে দেখা করে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব। জাস্ট রুটিন ওঅর্ক।'

লোকটাকে দেখল মাসুদ রানা। ওর থেকে কম করেও আধ ফুট লম্বা হবে সাশাদ। পাশেও তেমনি। মুখটা প্রায় চাঁদের মত গোল, থ্যাবড়া। চেহারা দেখে মনে হয় গোঁয়ার প্রকৃতির। হেরেন তার চাইতে ইঞ্চি তিনেক খাটো। গোবেচারা চেহারা। হালকা পাতলা গড়ন। মাসুদ রানাকেও মাপল দুই ডিটেকটিভ।

'ঘটনার সময় বাসায় ছিলাম না আমি,' বলল রানা। 'পত্রিকার সব কথায় সব সময় আস্থা রাখতে পারি না, তাই ভাবলাম, দায়িত্বশীল ডিটেকটিভদের সঙ্গে দেখা করাই ভাল।'

'একা থাকেন?' প্রশ্ন করল হেরেন। 'না সস্ত্রীক?'

'আমি অবিবাহিত।'

'বান্ধবী?'

'আছে কি না জানতে চাইছেন?'

মাথা দোলাল সাশাদ। 'সাথে কেউ থাকে কি না।'

'না। একাই থাকি।'

'স্থায়ী বাসিন্দা?'
'অস্থায়ী।'
'আপনার পেশা?'
'এক প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটিং কোম্পানির পরিচালক আমি। ব্যবসার খাতিরে প্রায়ই এ দেশে আসতে হয় আমাকে।'
'আপনি কোন্ দেশী?' জানতে চাইল হেরেন।
'বাংলাদেশী।'
'সে রাতে ঘটনার সময় বাসায় ছিলেন না আপনি?' প্রশ্ন করল সাশাদ।
'না।'
'অত রাতে কেন বেরিয়েছিলেন?'
'আমার অফিসে আগুন লাগার খবর পেয়ে।'
'রিয়েলি! কোথায় আপনার অফিস?'
'পার্ক অ্যাভিনিউ সাউথ।'
'ঠিক ক'টায় বাসা থেকে বেরিয়েছেন মনে আছে আপনার?'
'পরিষ্কার মনে আছে। ঠিক তিনটা পঁয়তাল্লিশে।'
বিস্মিত হলো দুই গোয়েন্দা। ঠিক হত্যাকাণ্ডের সময়ই ঘর ছেড়েছে লোকটা!
'আপনি শিওর?'
'একদম শিওর।'
'কি করে এত নিশ্চিত হচ্ছেন?'
'টেলিফোনের বেল শুনে ঘুম ভাঙে আমার। আমার অফিসের কাস্টডিয়ান অফিসে আগুন লাগার খবর দেয়ার জন্যে করেছিল ফোন। ঘুম ভাঙামাত্র ঘড়ি দেখি আমি, তিনটে চল্লিশ বাজে তখন। তৈরি হয়ে বেরোতে পাঁচ মিনিট মত লাগে আমার।'
'তাহলে সময়টার ব্যাপারে···আপনি শিওর, তাই না?' বলল হেরেন।
'হ্যাঁ।'
'বিল্ডিঙের সামনে কাউকে দেখেছেন তখন?'
'আমি সামনে দিয়ে বের হইনি। পিছন দিয়ে বের হয়েছি।'
'কেন?'
'ওই বিল্ডিঙের গ্যারেজ পিছনদিকে, সেভেনটি ফোর্থ স্ট্রীটে। গ্যারেজে ছিল আমার গাড়ি, তাই।'
'আই সী!' কলমের গোড়া দিয়ে দাঁতে তবলা বাজাল চিন্তিত সাশাদ। 'কোন শব্দ-টব্দও পাননি? কারও গলা অথবা পায়ের আওয়াজ?'
মুহূর্তের জন্যে চিন্তিত মনে হলো মাসুদ রানাকে।
'ইয়েস?
'হ্যাঁ, শুনেছি। আমার নিচতলার ভাড়াটে, এক মেয়ের গলা শুনেছি। কারও সাথে কথা বলছিল মেয়েটি।'
'কোন পুরুষের সঙ্গে?'
'হ্যাঁ।'

'কি বিষয়ে কথা বলছিল ওরা?'

'জানি না। শুনিনি। খুব তাড়ার ভেতর ছিলাম আমি।'

'মেয়েটি অল্প বয়সী?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ।'

'পরিচয় আছে আপনার সঙ্গে?'

'দেখা হলে "হাই" বা "হ্যালো" বিনিময় হয়, এই পর্যন্ত।'

নোট বই বন্ধ করে হাসল সাশাদ। 'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমাদের পালা শেষ, এবার আপনি যদি কিছু জানতে চান, প্রশ্ন করুন। আফটার অল আপনি নিজেও একজন ডিক।'

পাঁচ মিনিট পর সন্তুষ্ট হয়ে বিদায় নিল মাসুদ রানা। কাঁচের দেয়ালের ওপাশে প্রস্থানরত মাসুদ রানার পিঠের দিকে তাকিয়ে ফোঁস করে দম ছাড়ল সাশাদ। 'কি বুঝলে?'

'লোকটার কথাবার্তায় গণ্ডগোল আছে।'

'অর্থাৎ ওর ওপর নজর রাখতে হবে?'

'হ্যাঁ। অবশ্যই! ব্যাটা আগ বাড়িয়ে সাধু সাজতে এসেছে!'

'আমার কি মনে হয় জানো?' বলল হেরেন।

'কি?'

'মাসুদ রানার কোন বান্ধবী হবে আসলে মেয়েটা, নিচ তলার মেয়ের কথা বানোয়াট। লোকটা ছিল না বাসায়, একা বান্ধবী ছিল। মার্ক রাইডার ওরই বাসায় ওরই বান্ধবীর সাথে কুকাজ করতে গিয়েছিল। সম্ভবত প্রি-প্ল্যানড ছিল ব্যাপারটা নিচে লোক রেখে উপরে উঠে আসে মাসুদ রানা, ভয় পেয়ে পালাবার চেষ্টা করে নিহত যুবক, এবং তারপর···বুঝতেই পারছ!'

হেরেনের প্লটটা মনে মনে খানিক নাড়াচাড়া করল সাশাদ। চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'দি আইডিয়া!'

সোয়া সাতটায় ম্যাডিসন স্কয়্যার গার্ডেন পৌঁছল মাসুদ রানা। খেলা শুরু হতে আরও পনেরো মিনিট বাকি। গ্যালারি উপচে পড়ছে দর্শক। দুই পক্ষের নর্তন-কুর্দনরত টিনএজ ফ্যানদের চিৎকারে কান পাতা দায়। নিজের আসন খুঁজে বের করতে পাঁচ মিনিট লাগল রানার। এখনও পৌঁছায়নি লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। ওর পাশের আসন শূন্য।

গ্যালারি ঘিরে থাকা কাঁচের দেয়ালের ওপাশে মাঠের বরফ মসৃণ করার কাজে ব্যস্ত কয়েকটা হালকা রোলার। ওদিকে গোল পোস্ট ঠিক করার কাজ প্রায় শেষ। রিঙ্কের দুই মাথায় দুটো বড় ইলেক্ট্রোনিক ঘড়ি সময় নির্দেশ করে চলেছে ঘড়ি দেখছে রানা, মাঠের দিকে খেয়াল নেই এ খেলার 'খ'-ও বোঝে না সে।

আচমকা আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল মাঠের দর্শক-সমর্থক। মাঠে ঢুকে পড়েছে প্রতিযোগী দুই দল। কয়েকটা মাইক্রোফোনে একসঙ্গে বেজে উঠল রবার্ট মেরিলের 'আমেরিকা দ্য বিউটিফুল' গানটা। কে যে চালু করেছিল 'হুজুগে বাঙ্গাল' কথাটা বিরক্ত হয়ে ভাবল মাসুদ রানা। দুনিয়ার সবচেয়ে হুজুগে জাতি হচ্ছে এরা,

আমেরিকানরা। কি সমস্ত আজেবাজে জিনিস নিয়ে এরা নাচে, দেখে অবাক লাগে। কিম্ভূত দেখতে লাগছে খেলোয়াড়দের, শিম্পাঞ্জির মত। স্টিক মাথার ওপর তুলে ধেই ধেই করে নাচছে প্রত্যেকে—ওয়ার্ম আপ করছে। বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরাল রানা।

একটু পর বাঁশি বাজল, শুরু হয়ে গেল খেলা। অসহ্য লাগল ওর এক সময়। চলে যাবে কি না ভাবছে, এই সময় ওর উল্টোদিকের গ্যালারিতে মনে হলো যেন একটা পরিচিত মুখ দেখা গেল পলকের জন্যে। চোখ কুঁচকে ভাল করে তাকাল মাসুদ রানা। কে হতে পারে? আর দেখা গেল না তাকে। সাবধানে চোখের মণি ডানে-বাঁয়ে ঘোরাতে লাগল ও। দু'মিনিট পর আবার দেখা গেল মুখটা।

এবার তাকে চিনল মাসুদ রানা। প্যাটি হেরেন। ডিটেকটিভ। ওপাশের একটা আসনে বসে পড়েছে সে ততক্ষণে। মাঠ ছাড়া আর কোনদিকে খেয়াল নেই ঘড়ি দেখল রানা। এরই মধ্যে দশ মিনিট পেরিয়ে গেছে। ব্যাপারটা কি? আসবে না নাকি মেয়েটা? হেরেনের দিকে তাকাল মাসুদ রানা চোখাচোখি হলো। কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল ডিটেকটিভ। ভুরু কুঁচকে ভাবল ও, এই মিয়ার ব্যাপারটাই বা কি? খেলা দেখতেই এসেছে, না ওকে দেখতে? পিছনে তাকায়নি মাসুদ রানা। তাহলে দেখতে পেত, ওর কয়েক সারি পিছনে বসে আছে আরও একজন, অ্যারাম সাশাদ।

পাশের সীট দুলে উঠতে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'দুঃখিত,' অপ্রতিভ চেহারা করে হাসল মেয়েটি। 'দেরি করে ফেললাম।'

স্বস্তি পেল রানা। বলল, 'দ্যাট'স অল রাইট। বসুন।'

পিছনে এক হাত নিয়ে স্কার্ট সোজা রেখে বসল লেসলি ফর্সা দুই হাঁটু যুক্ত করে। 'কেমন দেখছেন খেলা?'

'খেলা দেখছি না। দেখছি লাফালাফি। এ খেলার কিছুই বুঝি না আমি।'

'আমিও না।'

অবাক হলো মাসুদ রানা 'তাহলে…?'

'এত ভিড়ের মধ্যে কেউ অনুসরণ করতে পারবে না আমাদের, তাই। মনে হয়েছে এরকম জায়গাই উপযুক্ত হবে…।'

চ্যাপ্টা বলটা রেঞ্জারের বার পোস্টে লেগে ফিরে আসায় সমর্থকদের হতাশা মাখা হুঙ্কারে পরের শব্দগুলো চাপা পড়ে গেল লেসলির।

কিছু সময় চুপ থেকে আবার মুখ খুলল সে 'আপনার ভ্রমণ সফল হয়েছে নিশ্চই?'

চোখ কোঁচকাল রানা। 'কিসের কথা বলছেন?'

'নানটুকেট ভ্রমণের কথা।'

'মোটামুটি।' এ মেয়ে সে খবর জানল কি করে ভাবল ও।

'অর্থাৎ আমার ব্যাপারে এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারেননি আপনি?'

'দুঃখিত, না। আরও কিছু তথ্য জানতে হবে আমাকে

'সেদিন একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভেবেও ভুলে গিয়েছিলাম

'কি কথা?'

'আমার বিশ্বাস ড্যানিয়েলসের রেখে যাওয়া কাগজপত্র আপনার হাতছাড়া

হয়ে গেছে ওগুলো পাওয়া না গেলে...'

'ওটা কোন সমস্যা হবে না।' প্রতিটা দলিলের রেকর্ড আছে, জানে মাসুদ রানা। একটু কষ্ট করলেই আরেক সেট জোগাড় করে নেয়া যাবে নির্ধারিত ফী দিয়ে

আমতা আমতা করতে লাগল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'মাত্র দু'সপ্তার ছুটি নিয়ে এসেছি আমি। ফিরে গিয়েই থিসিস জমা দিতে হবে এদিকে শেষ সেমিস্টার মার যাচ্ছে। কি যে করি!'

'আশা করছি এর মধ্যেই একটা যা হোক মীমাংসা করে ফেলতে পারব। কোন চিন্তা করবেন না।' চাউনি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মাসুদ রানার। গ্যালারির একেবারে নিচের ওয়াকওয়েতে দাঁড়ানো এক লোকের দিকে তাকাল। সরাসরি ওদের দিকে তাকিয়ে আছে লোকটা।

লেসলিও লক্ষ করেছে ব্যাপারটা। মুহূর্তে তটস্থ হয়ে উঠল সে। 'ওই লোকটা...ওই লোকটা...!'

'অস্থির হবেন না,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'এখানে ভয়ে...।' থেমে গেল ও। তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছে লেসলি। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে চেহারা। রানার কথা কানেই গেল না তার, ত্রস্ত পায়ে গেটের দিকে এগিয়ে চলেছে।

'শুনুন! দাঁড়ান!'

আমলই দিল না লেসলি। কয়েক পা গিয়েই ছুটতে শুরু করে দিয়েছে। রানাও উঠে দাঁড়াল। পিছু নিল তার। আবার গর্জে উঠল দর্শক, প্রতিদ্বন্দ্বীর গোলসীমার মধ্যে ঢুকে পড়েছে রেঞ্জার্স। এর মধ্যেও কিছু কিছু দর্শক খেয়াল করল ওদের ব্যাপারটা। করুণার হাসি ফুটল কয়েকজন পুরুষের মুখে। যে জন্যেই হোক, ভাবছে তারা, রেগেমেগে চলে যাচ্ছে বান্ধবী। মাসুদ রানা তাকে ফিরিয়ে আনতে বা শান্ত করতে ছুটছে।

পাত্তা দিল না ও, সরু ওয়াকওয়ে ধরে দ্রুত পায়ে এগোল। রানাকে বেশ খানিকটা পিছনে ফেলে দিয়েছে মেয়েটি, প্রায় পৌঁছে গেছে গেটের কাছে। চলতে চলতে ঘুরে তাকাল মাসুদ রানা। নিচের লোকটিও এগোচ্ছে গেটের দিকে। অবশ্য লেসলির অনেক পিছনে পড়ে আছে সে। বেশ অনেকগুলো ধাপ উঠতে হবে তাকে, তারপর নামতে হবে, তবেই পৌঁছতে পারবে গেটে। তারপর ঠিকমত এগোতেও পারছে না লোকটা। স্টেয়ারকেসেও প্রচুর দর্শক আছে। স্বেচ্ছাসেবী, গার্ডেন কর্তৃপক্ষের লোক, পুলিস। তাদের ফাঁক গলে এগোতে গিয়ে প্রতি পদে বাধা পাচ্ছে সে। শেষ সময়ে ওপাশে হেরেনকেও আসন ছাড়তে দেখল মাসুদ রানা।

বাঁক নিল মাসুদ রানা। দৌড়ে কয়েক ধাপ ওপরে উঠল, তারপর নামতে আরম্ভ করল। লেসলি আরও আগেই বেরিয়ে গেছে স্টেডিয়াম থেকে। বাইরে পা রেখেই মেয়েটিকে দেখতে পেল মাসুদ রানা। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। আবার ডাকল রানা। শুনলই না সে। রানাও দৌড় লাগাল এবার। কয়েক সেকেণ্ড পর পিছনে তিন জোড়া পায়ের আওয়াজ শুনতে পেল ও। কিন্তু তাকাল না।

এক ছুটে এইটথ্ অ্যাভিনিউ পৌঁছল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, ব্যস্ত ট্রাফিকের

মধ্যে ঢুকে পড়ল পাগলের মত। সংঘর্ষ এড়াতে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপারে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ক্রমাগত ব্রেক আর হর্নের আওয়াজে সচকিত হয়ে উঠল অ্যাভিনিউ। পথচারীরা অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল উন্মাদ মেয়েটির দিকে। আঁতকে উঠেছিল রানা দৃশ্যটা দেখে, তবে শেষ পর্যন্ত লেসলিকে আস্ত হাত-পা নিয়ে ওপারের সাইডওয়াকে উঠতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল।

সাইডওয়াকে এক ঝলক দেখা গেল তাকে, পরমুহূর্তে একটা পাঁচতলা হলুদ আর নীল সাইনবোর্ডে PARK লেখা বিল্ডিঙে ঢুকে পড়ল লেসলি। পাঁচতলা এক সেলফ সার্ভিস পার্কিং লট ওটা। এক মিনিট পর মাসুদ রানা ঢুকল লটে। সামনে একটা কাঁচের ঘরে বসে আছে বয়স্ক, মোটা এক লোক। পার্কের ম্যানেজার।

'একটা মেয়েকে ভেতরে ঢুকতে দেখেছেন?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'অনেক মেয়েকে ঢুকতে দেখেছি, মন,' জ্যামাইকান অ্যাকসেন্টে বলল সে। 'এটা এইটথ্ অ্যাভিনিউ!' যেন এই থেকেই উত্তরটা পেয়ে যাবে প্রশ্নকারী, এমন এক ভঙ্গি করল সে।

'এইমাত্র ঢুকেছে মেয়েটা দৌড়ে। গলায় স্কার্ফ আছে।'

আবার হাসল সে। হাত তুলে সিঁড়ি দেখাল। 'ওপরে গেছে। হ্যাপি ইভনিং, মন! হ্যাপি ইভনিং।'

এগোতে গিয়েও থেমে গেল মাসুদ রানা। পিছনের আওয়াজগুলো এসে পড়েছে। ঘুরে দাঁড়াল ও, একই মুহূর্তে ঝড়ের বেগে ভেতরে ঢুকল তিন ধাওয়াকারী। প্যাটি হেরেন এবং আরও দুই সাদা পোশাকধারী। ওদের একজনকে সন্দেহ করেই পালিয়েছে লেসলি। দলটা ভেতরে ঢোকামাত্র পৌঁছল অ্যারাম সাশাদ। রানাকে সামনেই দেখে দাঁড়িয়ে গেল সে। তারপর রাজকীয় ভঙ্গিমায় হেলেদুলে এগোল। হাতে ওয়াকি-টকি।

সাদা পোশাকের দু'জন ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলল নিচু গলায়। ঘুরে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে চলল তারা, উঠতে শুরু করল ওপরে।

রানার সামনে এসে দাঁড়াল সাশাদ। 'কোথায় গেল মেয়েটা?'

'কোন মেয়েটা?' পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'অ!' গম্ভীর হয়ে গেল ডিটেকটিভ। 'চিনতে পারছেন না?'

'আপনার পাশের সীটে খেলা দেখছিল যে মেয়ে,' বলল হেরেন। 'একটু আগেই এর ভেতর ঢুকতে দেখেছি তাকে আমরা। কোথায় সে?'

'আমার কাছে নেই। বিশ্বাস না হলে সার্চ করে দেখতে পারেন।'

'কথার মারপ্যাঁচ কষবেন না দয়া করে! বলুন, কোথায় সে?'

'জানি না। পালিয়ে গেছে আপনাদের ভয়ে। আপনারা ঘাবড়ে দিয়েছেন ওকে।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল সাশাদ, যান্ত্রিক কণ্ঠে কথা বলে উঠল তার ওয়াকি-টকি।

'সার্জেন্ট, ওপরে আসুন,' বলল কণ্ঠটা। 'বোধহয় পেয়েছি আমরা ওকে।'

রানার দিকে তাকিয়ে মধুর হাসি দিল সাশাদ। ঘুরে সিঁড়ির দিকে চলল। পিছনে হেরেন। নীরবে তাদের অনুসরণ করল রানা। দোতলার এক্সিট র‍্যাম্পে দাঁড়িয়ে আছে নীল একটা পন্টিয়াক। গাড়িটাকে যেতে দিচ্ছে না প্রথম দুই

ডিটেকটিভ, পথ আগলে রেখেছে। এক পা ভেতরে, আরেক পা বাইরে রেখে দাঁড়িয়ে ওটার চালক। দীর্ঘদেহী, দামী ওভারকোট পরা বয়স্ক এক লোক। ভেতরের গ্রে-সুটটাও দামী তার। অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। আরও কয়েক জোড়া পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল সে।

'কি হয়েছে?' জানতে চাইল সাশাদ।

'সব ফ্লোর খুঁজে দেখেছি আমরা,' এক ডিটেকটিভ বলল। 'কোথাও নেই মেয়েটা।'

'তো?'

'ইনি চলে যাচ্ছেন। বললাম বুটটা খুলে দেখাতে আমাদের, কিন্তু ভদ্রলোক রাজি হচ্ছেন না।'

তার দিকে ফিরল সাশাদ। 'কেন খুলছেন না ওটা?'

'দেখুন, পেট্রোলম্যান...'

'ডি-টেক-টিভ!' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল সাশাদ।

'সরি, ডিটেকটিভ,' সংশোধন করল লোকটা। 'দেখুন, আমি কোনও ক্রিমিনাল নই। তবু কেন আমার সঙ্গে এমন আচরণ করা হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারছি না আমি।'

'আপনাকে বেশ অসন্তুষ্ট মনে হচ্ছে,' নরম গলায় মন্তব্য করল সাশাদ।

'অসন্তুষ্ট হওয়ারই কথা! আমি একজন ভদ্রলোক। আমি বলছি আমার বুট খালি, কিছু নেই ওতে। আপনাদের বিশ্বাস করা উচিত।'

'অবশ্যই বিশ্বাস করা উচিত,' মাথা ঝাঁকাল অ্যারাম সাশাদ। 'এবং আমি মোটেও অবিশ্বাস করছি না! কিন্তু তারপরও, যদি আমি ইনসিস্ট করি, আপনি কি ভদ্রতার খাতিরে হলেও বুটটা খুলে দেখাবেন না আমাদের?'

'ওহ্! দারুণ এক দৃশ্য!' পিছন থেকে বলে উঠল মাসুদ রানা, কণ্ঠে পরিষ্কার ব্যঙ্গ। 'কী অভিনয়! হাত তালি দিতে ইচ্ছে করছে আমার।'

এক যোগে ঘুরে তাকাল সবাই। 'কি?' হুঙ্কার ছাড়ল সাশাদ। 'মানে?'

'একজন ডেটেকটিভ নিরীহ এক নাগরিককে তার গাড়ির বুট খুলতে ইনসিস্ট করছেন, ওয়ারেন্ট ছাড়া,' চোখ মটকাল ও। 'তা-ও একজনকে সাক্ষী রেখে দারুণ নয়?'

খাই-খাই চোখে মাসুদ রানাকে দেখল কিছুক্ষণ সাশাদ তারপর হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। চোখ ইশারায় ডিটেকটিভ দু'জনকে সরে যেতে বলল সে এক মুহূর্ত পর রওনা হয়ে গেল পন্টিয়াক। হাসি মুখে রানাও ঘুরে দাঁড়াল, সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল মাসুদ রানা চোখের আড়ালে চলে যেতে হাউমাউ করে উঠল হেরেন, 'তোমাকে বলিনি আমি? এই সেই মেয়ে, যার সঙ্গে সে-রাতে লটর পটর করছিল মার্ক রাইডার। এরা দুটোই দায়ী ওই খুনের জন্যে। অপরাধী না হলে শুধু শুধু কেন পালাল মেয়েটা? আমরা বাঘ না ভাল্লুক? খেয়ে ফেলতাম নাকি ওকে?'

সাশাদ কোন মন্তব্য করল না।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মাসুদ রানা সুইচের দিকে ডান হাত

বাড়িয়ে অন্য হাতে দরজাটা বন্ধ করতে গিয়েও থেমে গেল। শির শির করে উঠল ওর সারা শরীর। কেউ আছে ঘরের মধ্যে। কে! কেমন একটা মিষ্টি গন্ধ পেল রানা নাকে।

দপ্ করে জ্বলে উঠল ঘরের আলো। ওর এক হাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। অবাক হওয়ারও সময় পেল না মাসুদ রানা। বলে উঠল মেয়েটি, 'দরজাটা বন্ধ করে দিন প্লীজ!'

'ওয়েল!' দরজা লাগিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। 'কে কার বাড়িতে অনধিকার প্রবেশের জন্যে দায়ী? আমি আপনার, না আপনি আমার?'

কথা হাতড়াতে লাগল মেয়েটি। 'আমি···মানে, দুঃখিত, রানা। আমি···।'

'ওভাবে পালিয়ে আসার কোন প্রয়োজন ছিল কি?'

'কি বলছেন আপনি!' চোখ বড় বড় করে বলল সে। 'ওই লোকটা নজর রাখছিল আমার ওপর, দেখেননি? আমার ধারণা আর্থার স্যান্ডলারের···'

'ওরা পুলিস ছিল।'

'অ্যাঁ? আপনি জানতেন?'

'জানতাম।'

'কিন্তু···?'

'আপনাকে নয়, ওরা আমাকে অনুসরণ করছিল আমার বিশ্বাস।'

'আপনাকে! কেন?'

'সেটা ওদের জিজ্ঞেস করে জানব ভেবেছিলাম, কিন্তু সময় দিলেন কই আপনি?'

কিছু সময় নীরব থাকল মেয়েটি। সন্দিগ্ধ। 'আপনি ঠিক বলছেন?'

'বেঠিক কেন বলতে যাব?'

আশ্বস্ত হলো লেসলি। 'ওহ্, গড! আর আমি কি না···!'

'এতবড় এক উপকার করলাম, অথচ এখনও একটা শুকনো ধন্যবাদও জানাননি কিন্তু আপনি বিনিময়ে।'

'কিসের?' বলেই বুঝল লেসলি, হেসে উঠল নিঃশব্দে। 'ও হ্যাঁ, দুঃখিত। ধন্যবাদ। কিন্তু এখন বুঝলাম কষ্টটা মাঠেই মারা গেল।'

বসল ওরা মুখোমুখি। 'আপনাকে পুলিস কেন অনুসরণ করছে বললেন না তো?' কাঁধের ব্যাগটা কোলের ওপর রেখে তার ওপর দুই হাতের ভর চাপাল মেয়েটি।

'কারণ একটা আছে অবশ্য। কিন্তু সে জন্যে ওরা আমাকে অনুসরণ করবে কেন বুঝে উঠতে পারছি না। সত্যিই বুঝতে পারছি না। সে যাক, আপনি আমার ঘরে ঢুকলেন কি ভাবে?'

'যে কোন তালা খুলতে ওস্তাদ আমি,' যেন কথার কথা, এমনভাবে বলল লেসলি।

'আপনার উদ্ধারকারী বন্ধুটি কে ছিলেন?'

'দুঃখিত, তার পরিচয় ফাঁস করতে পারব না।' একটু বিরতি। 'আসলে খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। আমার জীবনটাই এমন, মাসুদ রানা, কাকে বিশ্বাস

করব আর কাকে করব না, সব সময় বুঝে উঠতে পারি না।' মাথা দোলাল সে 'ছি, ছি! শুধু শুধুই এত পণ্ডশ্রম করলাম!'

'করেই যখন ফেলেছেন, কি আর করা।'

নীরবতা।

'অ্যাডলফ জেঙ্গার আমার সম্পর্কে কি বলল? পজিটিভ কিছু, না নেগেটিভ?'

'নেগেটিভ।'

'কি?'

'আপনার অস্তিত্ব আছে মানতেই চায় না সে।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম, টেলিফোন বেজে উঠতে চেপে গেল। 'আমি যখন ভেতরে ঢুকি তখনও বাজছিল ফোনটা। অনেকক্ষণ ধরে বেজেছে।'

কোন মন্তব্য না করে রিসিভার তুলল মাসুদ রানা। 'ইয়েস?'

'শওকত বলছি, মাসুদ ভাই। অনেকক্ষণ থেকেই আপনাকে ধরার চেষ্টা করছি।'

'বাইরে ছিলাম, দুঃখিত। বলো। কি ব্যাপার?'

'ওই ফিঙ্গারপ্রিন্টের ব্যাপারে।'

'হ্যাঁ। কি হয়েছে?' মুখ তুলে মেয়েটিকে দেখল রানা। টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টাতে শুরু করেছে সে। কিন্তু রানার মনে হলো কান পেতে আছে এদিকে। যদিও বুঝবে না কিছুই, কারণ বাংলায় কথা বলছে ওরা।

'প্রথমে ওটা নিয়ে স্টেট ডিটেকটিভ ব্যুরোতে গিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'ওখানে কিছু না পেয়ে পরে গেলাম এনওয়াইপিডি-র পুলিস প্লাজা ওয়ানের কম্পিউটারে, সেখানেও নেই কিছু।'

'তার মানে ক্লীন?'

'জ্বি না।'

'আই সী! বলে যাও।'

'ওদের সাহায্যে ওয়াশিংটনের ফেডারেল কম্পিউটরের সাথে পরে যোগাযোগ করতে গিয়ে অন্যরকম সাউণ্ড পেলাম।'

'তাই নাকি?' আবার লেসলির দিকে তাকাল মাসুদ রানা। পত্রিকা দেখছে সে মন দিয়ে। আসলে ভান করছে। হাত নড়ছে না তার। কান খাড়া করে বসে আছে।

'জ্বি। এদিকে বিকেলে এক ভিজিটরও এসেছিল আমার অফিসে। এফ.বি.আই।'

কপাল কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। লোকটার নাম পিট লেমন। এফ.বি.আই। ফেডারেল কম্পিউটরের সাউণ্ডিং ওয়াশিংটনে চমকে দিয়েছে নাকি সবাইকে। ওটা ক্লাসিফাইড ফিঙ্গারপ্রিন্ট। আমরা ওই ছবি আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট কোথায় পেলাম ভেবে লেমনকে খুবই চিন্তিত মনে হয়েছে। আধ ঘণ্টা ধরে রীতিমত জেরা করেছে ব্যাটা আমাকে।'

'তারপর?'

'আমি উত্তর দেইনি বলে ভীষণ চটে গেছে আমার ওপর। আমি বললাম আমার সোর্স আমি তোমাকে জানাতে বাধ্য নই। লেমন হুমকি দিয়ে গেছে আমাকে দিয়ে তথ্যটা সে বের করিয়ে তবে ছাড়বে।'

'কি ভাবে বাধ্য করবে?'

'বলেছে, খুব শিগগিরি ফেডারেল কোর্টের অর্ডার নিয়ে ফের আসবে সে। ওতে সোর্স প্রকাশ করার নির্দেশ থাকবে আমার প্রতি।'

'আচ্ছা! এতই চমকে গেছে?'

'তাই তো দেখছি,' চিন্তিত কণ্ঠে বলল শওকত। 'লোকটা চলে যাওয়ার পর এফ.বি.আই-র এখানকার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বিষয়টা নিয়ে আভাসে ইঙ্গিতে কথা বলেছি আমি।'

'কি বলে সে?'

'কেবল দুটো শব্দ উচ্চারণ করল সে, "ড্রপ ইট"।'

'হুঁম! ঠিক আছে। ভাল করেছ। রাখি।' রিসিভার রেখে সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। অন্যমনস্ক।

'কার ফোন?' মুখ তুলল লেসলি।

'আমার এক বন্ধুর।'

উত্তরটা বিশ্বাস করবে কি না ভাবল একটু। 'প্রসঙ্গটা কি আমি?'

'কেন এমন মনে হলো আপনার?'

ঠোঁট উল্টে কাঁধ ঝাঁকাল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। 'জানি না। তবে মনে হলো।'

'হ্যাঁ। ঠিকই ধরেছেন।'

'সত্যি করে বলুন, আমাকে অবিশ্বাস করেন আপনি?'

'বিশ্বাস বা অবিশ্বাস কোনটাই করতে আরম্ভ করিনি এখনও। আপনার জীবন বৃত্তান্ত শুনেছি আমি। জন্ম এবং আপনার বাবা-মার বিয়ের দলিল দেখেছি, বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছে আমার ওগুলো। কিন্তু ভাবছি...!'

'কি ভাবছেন?'

'জেঙ্গার কেন বললেন আপনার দাবি ডাহা মিথ্যে? আপনি ভুয়া?'

'মিথ্যে কথা বলেছে লোকটা!' চেহারায় রাগ রাগ ভাব ফুটল লেসলির।

'ফেডারেল কম্পিউটারে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট কেন?'

মুহূর্তের জন্যে স্থির হয়ে গেল মেয়েটি। বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল ওর প্রশ্ন। 'কোথায় পেলেন এ খবর? বন্ধু জানিয়েছেন?'

'হ্যাঁ।'

আবার কয়েক মুহূর্ত ভাবল সে। 'আর্থার স্যান্ডলার।'

'বুঝলাম না।'

'যে কোন মুহূর্তে আবার পিছু নেবে সে আমার।'

'কি করে?'

'সে সি. আই. এ-র ডীপ কভার এজেন্ট, অনেক অনেক উঁচুতে তার স্থান। সে-ই আমার প্রিন্ট সংরক্ষণ করেছে ফেডারেল ফাইলে, যাতে, যদি কখনও

পজিটিভ সাউন্ডিং আসে কোনদিক থেকে, সে আমাকে ধাওয়া করতে পারে। শেষ করে ফেলতে পারে। কারণ পৃথিবীতে আমিই তার এক ও একমাত্র শত্রু। সুযোগ পেলে আর্থারের অস্তিত্ব আমি ফাঁস করে দেব তা আর্থার খুব ভালই জানে। আপনাদের খোঁচাখুঁচির ফলে এটুকু অন্তত সে এখন জানে যে আমি নিউ ইয়র্কে আছি। আমি ভয় পাচ্ছি লোকটা হয়তো নতুন করে পিছু নেবে আমার।'

'এখনই যদি না-ও আসে, আপনি যখন তার সম্পত্তিতে থাবা বসাবেন তখন আর্থার এমনিতেই আসবে। ব্যাপারটা শুধু সময়ের, লেসলি। যদি ভুয়া না হয়ে থাকেন আপনি।'

'আমি ভুয়া নই,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম।

# সাত

লণ্ডন সময় ভোর সাড়ে ছ'টায় হিথ্রো পৌঁছল মাসুদ রানা। এয়ারপোর্টের এক কার রেন্টাল সার্ভিস থেকে একটা পিগট ভাড়া করল, ছুটল সোজা দক্ষিণ-পশ্চিমের নর্থ ফেনউইক, যেখানে সিকি শতাব্দী আগে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল আমেরিকান আর্থার স্যান্ডলার ও ব্রিটিশ এলিজাবেথ চ্যাটসওয়ার্থ।

নর্থ ফেনউইক খুদে এক মফস্বল শহর। ভিড়ভাট্টা, হৈ-চৈ একেবারেই নেই। ছবির মত সুন্দর, নিরিবিলি এক শহর। কল-কারখানার ধোঁয়া নেই, নেই ট্রাফিকের ব্যস্ততা। বাতাস এখানকার নির্মল, দূষণমুক্ত। তবে ঠাণ্ডা প্রচণ্ড। সব বাড়ির চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উড়ছে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তৈরি বাদামী পাথরের গুরুগম্ভীর চেহারার সেন্ট জর্জে'স চ্যাপেল খুঁজে পেতে বিশেষ বেগ পেতে হলো না রানাকে।

ওটার গেটের বাইরে, বড় রাস্তায় পিগট পার্ক করল ও। সামনের সবুজ লনের মাঝের সুরকি বাঁধানো পথ ধরে হেঁটে এগোল। ভেতরটা তেমন উষ্ণ নয়। প্রায় বাইরের মতই ঠাণ্ডা। মৃদু আলোয় আলোকিত প্রার্থনা হল। কেউ নেই ভেতরে, একদম ফাঁকা। দু'দিকে কুশনমোড়া কাঠের বেঞ্চ, মাঝখানে সরু রাস্তা। পায়ে পায়ে বেদীর দিকে এগিয়ে চলল মাসুদ রানা।

বাঁ দিকের দেয়ালে, উঁচুতে, ধপধপে সাদা পাথরের একটা মূর্তি। সেন্ট জর্জে'স চ্যাপেলের প্রতিষ্ঠাতা জর্জ লরিকের প্রতিকৃতি। তাঁর পায়ের পাথুরে জুতোর ডগায় লেখা আছে তাঁর জন্মমৃত্যুর সময়কাল। ১৪৭০-১৫৪৫। সামনের বেদীটার দিকে নজর দিল মাসুদ রানা। ওখানেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিয়েটা. লেসলির মা ও বাবার, যদি তার কথা মিথ্যে না হয়ে থাকে।

ডানদিকের দেয়ালে ঝোলানো কাঠের বড় এক নেমপ্লেটের ওপর চোখ বোলাল মাসুদ রানা। এর প্যাসটরদের নাম লেখা আছে ওতে। ব্যগ্র চোখে নজর বোলাল ও প্লেটটার ওপর। নিচের দিকে এসে আটকে গেল রানার দৃষ্টি। নামটা পরিষ্কার লেখা আছে-জোনাথন ফিলিপ মূর, প্যাসটর, ১৯৩৭-১৯৬৩। ওর পর আরও দু'জনের নাম আছে, শেষ নামটা বর্তমান প্যাসটরের।

গির্জা থেকে বেরিয়ে টাউন হলে এল মাসুদ রানা। রেকর্ড কীপার এক বয়স্ক মহিলা। খাটো, মোটা। মুখের চামড়া কোঁচকানো। পুরু দুটো উলের জাম্পার পরে আছে সে। মহিলার অনুমতি নিয়ে টাউন রেকর্ড নিয়ে পড়ল রানা, জন্ম, বিয়ে ইত্যাদির রেকর্ড। লম্বা একটা কাঠের টেবিলে বসল ও, ব্যস্ত হাতে রেজিস্টারের পাতা ওল্টাতে লাগল। দূর থেকে সন্দিগ্ধ চোখে রানাকে লক্ষ করছে বুড়ি কীপার।

ম্যারেজ রেজিস্টারের ১৯৫৯ সালের তালিকা বের করল মাসুদ রানা। তারপর বের করল অক্টোবর মাস। তিনটে বিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে সে মাসে। শেষেরটি লেসলির বাবা-মার। লেখা আছে গোটা গোটা হস্তাক্ষরে বিবাহিত—আর্থার এডওয়ার্ড স্যান্ডলার, নিউ ইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র—এলিজাবেথ অ্যান চ্যাটসওয়র্থ, টিভারটন, ডেভন, গ্রেট ব্রিটেন। ২০ অক্টোবর, সকাল ১০টা।

প্রয়োজন নেই, তবু পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত হওয়ার জন্যে চামড়া বাঁধানো লেজারটা উল্টেপাল্টে দেখল মাসুদ রানা। ঠিকই আছে। এটা নিঃসন্দেহে আসল। এবং প্রতিটি এন্ট্রিও তাই, ভুয়া হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। চোখ তুলতেই বৃদ্ধাকে নিবিষ্টমনে ওকে পর্যবেক্ষণ করতে দেখল মাসুদ রানা।

'মৃতদের নামের তালিকা কোথায় পাব?'

'মৃত?' খ্যাঁক করে উঠল বুড়ি তীক্ষ্ণ গলায়। 'ওই লেজারেই।'

'অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডারে?'

'না।'

এবার 'ডেথ সেকশন' খুঁজে বের করল মাসুদ রানা। আর্থার—অ্যান বিয়ের সার্টিফিকেটের একটা ফটোকপি নিয়ে এসেছিল ও সঙ্গে করে। লেসলির মুখে শুনেছে রানা, তখনকার প্যাসটর বা ওদের বিয়ে অন্য দুই সাক্ষীর কেউ বেঁচে নেই। নিশ্চিত হওয়া দরকার। সেকশনের পুরোটাই ঘাঁটতে হলো ওকে। এবং পাওয়াও গেল নামগুলো। সর্বশেষ সাক্ষী, ডেভিড স্কাউলার, চার বছর আগে মারা গেছে। ওর ব্যস্ততার ফাঁকে দুপুর গড়িয়ে গেল।

টাউন হল থেকে বেরিয়ে এক রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ খেলো মাসুদ রানা। তারপর হাজির হলো টাউন ক্লার্ক-এর অফিসে। সমস্ত জন্ম এখানেই রেকর্ড করা হয়। যা জানা প্রয়োজন আধ ঘণ্টার মধ্যে জেনে নিল রানা। ১৬ আগস্ট, ১৯৬০ সালে এখানকার আলটিংহ্যাম হসপিটালে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন এলিজাবেথ অ্যান চ্যাটসওয়ার্থ, আর্থার স্যান্ডলারের স্ত্রী। মেয়ের নাম লেসলি স্যান্ডলার।

খুব ইচ্ছে হলো রানার এক্সিটার থেকে ঘুরে আসে একবার। দেখে আসে লেসলিদের বাসভবন, তার মায়ের সেই পাব। কিন্তু সময় নেই। তাড়াতাড়ি লণ্ডন ফিরে যেতে হবে। সন্ধে সাড়ে সাতটায় হিথ্রো পৌঁছল মাসুদ রানা। পিগট ফেরত দিয়ে একটা পাবলিক ফোন বুদে ঢুকল। লেসলির দেড় দশকের অন্ধকার জীবন ঘুরপাক খাচ্ছে ওর মাথার মধ্যে। সত্যিই কি এতগুলো বছর প্রাণের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছে মেয়েটি? নাকি...।

ইন্টারন্যাশনাল অপারেটরের মাধ্যমে সুইটজারল্যাণ্ডের ডিরেক্টরি অ্যাসিসটেন্সের সাহায্য চাইল মাসুদ রানা। ওর প্রশ্নের উত্তরে দু'মিনিট পর জানানো হলো, ভিভিতে জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম নামে কেউ নেই। অনুরোধে এরা

ঠেকিও গেলে কখনও কখনও। মাসুদ রানার আবেদনে খানিক আঁইগুঁই করে কাজে লেগে পড়ল ডিরেক্টরি অ্যাসিসটেন্ট। রিসিভার ধরে প্রতীক্ষা করতে করতে সাহায্যপ্রার্থী মাসুদ রানা বিরক্ত হয়ে উঠলেও সাহায্যকারী হাল ছাড়ল না।

ঝাড়া পনেরো মিনিট পর সাড়া দিল অপর প্রান্ত। হ্যাঁ, জানাল লোকটা, পাওয়া গেছে জর্জ ম্যাকঅ্যাডামকে। লুর্টরি থাকেন ভদ্রলোক, ১৬, রু ডি পডাল্প-এ। জায়গার নামটা শোনামাত্র চিনল মাসুদ রানা, নামে চিনল আর কি! এই শহরেরই কোন এক বোট বেসিনে চাকরি নিয়েছিল লেসলি। কলটা প্লেস করার অনুরোধ জানাল মাসুদ রানা, তারপর কি কি বলবে, মনে মনে মহড়া দিতে লাগল। ম্যাকঅ্যাডামই একমাত্র জীবিত ব্যক্তি, অন্তত এখন পর্যন্ত, যিনি লেসলির কাহিনী কনফার্ম করতে পারেন।

রিং বাজছে ও প্রান্তে, আওয়াজটা একদম পরিষ্কার। বেজেই চলেছে। তিনবার। চারবার। তারপর আবার। ধরছে না কেউ। অবশেষে সপ্তম রিঙে সাড়া দিল একটা বাজখাঁই কণ্ঠ। ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট, কোন ভুল নেই তাতে। 'জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'আপনি কে?'

'আমার নাম মাসুদ রানা। লণ্ডন থেকে বলছি আমি।'

'কি প্রয়োজন আমাকে আপনার?' চাঁছাছোলা প্রশ্ন বৃদ্ধের।

'আমি লেসলির বন্ধু। ওর ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কিছু বলতে চাই আমি।'

দীর্ঘ নীরবতা। 'লেসলির বন্ধু? কি করেন আপনি?'

'ব্যবসা করি।'

'কোথায়?'

'নিউ ইয়র্কে।'

'হুঁম! তো কি? লেসলির ব্যাপারে কি বলতে চান আপনি?'

'ওকে আমি সাহায্য করতে চাই। কিন্তু কোন পদক্ষেপ নেয়ার আগে আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া জরুরী। লেসলির অতীত জানতে চাই আমি।'

'তাতে আপনার লাভ?'

'আমার লাভের জন্যে ফোন করিনি আমি, মিস্টার ম্যাক, আমি লেসলির লাভের কথা ভেবে ফোন করেছি। এর সঙ্গে লেসলির আইনগত দাবির বিষয় জড়িত।'

আবার কিছু সময় নীরব থাকল লাইন। 'পুওর লেসলি! কিন্তু এ নিয়ে টেলিফোনে কোন কথা বলতে চাই না আমি। কিছু জানতে হলে এখানে আসতে হবে আপনাকে।'

'আমিও সেটাই চাইছি।'

'অল রাইট।'

চারদিকে উঁচু ইটের দেয়ালঘেরা শানদার এক ভিলায় থাকে জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম কালো রং করা স্টীলের গেট। ভিলাটা জেনেভা লেকের উত্তরের এক পাহাড়ে গেটে কোন নেম প্লেট দেখতে পেল না মাসুদ রানা মেইল পটেও নাম নেই

বাড়ির মালিকের। এমনকি কোন কলিংবেলও নেই।

উঁচু হয়ে ভেতরে তাকাল ও। নাহ্, দেখা গেল না কাউকে। বাধ্য হয়ে নিজেই গেটের ল্যাচ খুলল রানা, এক পাল্লা সামান্য ফাঁক করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। গেট বন্ধ করে ভিলার দিকে এগোল ও। গেট এবং ভিলার মাঝামাঝি পৌঁছেছে, এই সময় আওয়াজটা কানে এল, থমকে দাঁড়িয়ে গেল মাসুদ রানা। বিশাল দুটো জার্মান শেফার্ড কোত্থেকে ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। আঁতকে উঠল রানা। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

চাপা গলায় গজরাচ্ছে, ঠোঁট সরে গিয়ে ভয়ঙ্কর দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওদের। ঝাঁপ দিল বলে। এই সময় ভেতর থেকে ভেসে এল একটা ক্রুদ্ধ হুঙ্কার, সঙ্গে সঙ্গে জমে গেল দুই শেফার্ড। ভিলার বন্ধ দরজা খুলে গেল। শব্দ শুনে চোখ তুলল মাসুদ রানা। দোরগোড়ায় হুইল চেয়ারে বসা প্রকাণ্ডদেহী এক বদরাগী চেহারার বৃদ্ধ রানাকে দেখছে অপলক চোখে। এক মুহূর্ত পর আবার এক দুর্বোধ্য হুঙ্কার ছাড়ল সে, গুটি গুটি পায়ে মনিবের কাছে ফিরে গেল কুকুর দুটো।

'মাসুদ রানা?'

'হ্যাঁ।'

'আসুন।'

বৃদ্ধের ওপর চোখ রেখে এগোল মাসুদ রানা। বিরাট মুখ জর্জ ম্যাকঅ্যাডামের। টকটকে লাল চেহারা। চাউনি কঠোর, নির্দয়। বাদামী রঙের হেরিংবোন জ্যাকেট পরে আছে লোকটা। গায়ে সাদা শার্ট, গলায় রেজিমেন্টাল টাই। তার দু'পাশে ঠাঁই গেড়ে বসেছে ভয়ঙ্কর দর্শন কুকুর দুটো। ওগুলোকেও দেখল মাসুদ রানা।

'আপনি একা?'

মাথা দোলাল ও। 'হ্যাঁ।' বৃদ্ধের ছয় ফুটের মধ্যে পৌঁছে গেছে মাসুদ রানা।

'থামুন!' কর্কশ গলায় বলল জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম।

'কি ব্যাপার?' বিস্মিত হলো ও।

'আপনাকে সার্চ করব আমি।'

'কেন?'

'আপনার আপত্তি আছে মনে হয়?'

'না না, কিসের আপত্তি? কিন্তু তার কি কোন প্রয়োজন আছে?'

'আপনার না থাকতে পারে, আমার আছে। দয়া করে হাত দুটো তুলুন মাথার ওপর।'

'আমার কাছে একটা পিস্তল আছে,' উপায় নেই দেখে আগেভাগেই জানিয়ে দিল রানা।

সঙ্গে সঙ্গে চেহারা বিগড়ে গেল বৃদ্ধের। 'কেন?' রীতিমত চার্জ করল সে। চাউনিতে দোদুল্যমান সন্দেহ। 'পিস্তল কেন?'

'লাইসেন্স করা পিস্তল,' তাড়াতাড়ি লোকটাকে আশ্বস্ত করতে চাইল মাসুদ রানা। 'আমি ব্যবসায়ী। তাই ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে সব সময় সঙ্গে রাখি ওটা। যদি বলেন, আমিই বের করে দিতে পারি।'

'কোন দরকার নেই। আমি নিচ্ছি।' ত্রিশ সেকেণ্ড পর মোটামুটি সন্তুষ্ট হলো লোকটা। ওয়ালথার দোলাতে দোলাতে বলল, 'যাওয়ার সময় ফেরত পাবেন এটা। আসুন, ভেতরে আসুন। তবে দয়া করে সতর্ক থাকবেন। কুকুর দুটো প্রতি মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত থাকবে, যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সম্পূর্ণ সক্ষম ওরা।'

'আমি আপনার শত্রু নই, মিস্টার অ্যাডাম। আমি এসেছি...'

রীতিমত অভদ্রভাবে থামিয়ে দিল ওকে লোকটা। 'আমি শুনেছি কেন এসেছেন আপনি। এক কথা বার বার শুনতে ভাল লাগে না আমার। হাঁটুন।' মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে আগে যাওয়ার নির্দেশ দিল লোকটা। মাঝখানে থাকল কুকুর দুটো, পিছনে সে।

প্রথমে ভিলার ফয়েই-এ নিয়ে আসা হলো মাসুদ রানাকে। সেখান থেকে একটা লাইব্রেরি রুমে। 'এখানেই বসা যাক,' পিছন থেকে বলে উঠল জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম।

ঘরের এক কোণে এক সেট সোফা দেখে সেদিকে এগোল মাসুদ রানা। বসল একটা সিঙ্গেল সোফায়। ওর দশ গজ তফাতে একটা রীডিং টেবিলের ওপাশে বসল বৃদ্ধ। কুকুর দুটো অবস্থান নিল দু'জনের মাঝখানে। ম্যাকঅ্যাডামকে ভাল করে দেখল এবার মাসুদ রানা। মাথার চুল পাতলা হয়ে চাঁদি বেরিয়ে পড়েছে বৃদ্ধের। গালের চামড়া ঢিলেঢালা, চাউনিটা যেন কেমন। ভাল লাগল না রানার।

তার পিছনের দেয়ালে কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো একটা এনগ্রেভড্ সার্টিফিকেট দেখা যাচ্ছে। নিশ্চয়ই জর্জ ম্যাকঅ্যাডামকে দেয়া ব্রিটিশ রাজের কোন সনদপত্র। লেখাগুলো বোঝা যাচ্ছে না এত দূর থেকে।

'বলুন,' নড়েচড়ে বসল বৃদ্ধ।

'আপনার পালক মেয়ের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী আমি।'

'আমি ওকে নিজের মেয়ে বলেই জানতাম। পালক ভাবিনি কখনও।'

'দুঃখিত। আপনার মেয়ের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী আমি। আপনার সাহায্য পেলে লেসলি উপকৃত হবে।'

'আমার সাহায্য?' মুখের ভঙ্গি এমন করল লোকটা, যেন সাহায্য কথাটা খুব জঘন্য কিছু।

'আমার কথা শুনে কি খুব অবাক হচ্ছেন আপনি?' বিরক্ত হয়ে উঠল মাসুদ রানা।

'হতে শুরু করেছি।'

'কেন?'

ওর আগাপাশতলা মাপল বৃদ্ধ কঠিন চোখে। উত্তর দিল না।

'আপনার মেয়ে নিউ ইয়র্কে আছে এ মুহূর্তে। সে দাবি করছে, তার জন্মদাতা এক মার্কিন মালটিমিলিয়নেয়ার। লোকটার নাম...'

'আমি জানি তার নাম।'

'আমি জানি আপনি জানেন। আমি এ-ও জানি আপনি কে, কি ছিলেন।

কিভাবে কোথায় আহত হয়ে অবসর নিয়েছেন।'

'এত কথা কে বলেছে আপনাকে?' চোখের কোণ কুঁচকে উঠল ম্যাকঅ্যাডামের। 'লেসলি?'

'নিশ্চই!'

'আপনি ওর কতখানি ঘনিষ্ঠ?'

'আমরা একে অপরের বন্ধু।'

'কতদিন থেকে পরিচয়?'

'অনেকদিনের।'

একটু ভাবল বৃদ্ধ। তারপর মাথা ঝাঁকাল। 'নিজের সম্পর্কে কি কি বলেছে সে?'

'তার বাবা-মার প্রেম, বিয়ে। নিজের জন্ম। পরবর্তীতে আপনার তাকে পালক মেয়ে বলে গ্রহণ করা। এখানে জিসারেল্লি নামে এক ইটালিয়ান যুবককে হত্যা করার পর তার কানাডায় চলে যাওয়া, ইত্যাদি সবই বলেছে।'

'তাহলে নতুন করে আর কি জানতে চান আপনি আমার কাছে? সবকিছুই তো বলেছে লেসলি!'

'আমি জানতে চাই ওর বক্তব্য আপনি সত্যি বলে মানেন, কি মানেন না?'

'সে ক্ষেত্রে তার বক্তব্য বিস্তারিত শুনতে হবে আমাকে। নিশ্চিত হতে হবে, ঠিক কি কি বলেছে আপনাকে লেসলি।'

'আমিও তাই চাইছি আসলে।'

'তাহলে শুরু করুন।'

শুরু করল মাসুদ রানা। ১৯৪৪ সাল থেকে। শেষ করল ১৯৭৬ সালে এসে, যে সময় হত্যার দায়ে সুইটজারল্যাণ্ড ত্যাগ করে কানাডায় চলে যেতে বাধ্য হয় লেসলি, নিজের সম্পর্কে যতদূর বলেছে সে, সেই পর্যন্ত এসে। বলা শেষ হতে উত্তরের অপেক্ষায় থাকল ও, কিন্তু মুখ খোলার কোন লক্ষণ দেখা গেল না ম্যাকঅ্যাডামের মধ্যে। একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়েই থাকল লোকটা। বেশ অনেকক্ষণ পর যেন ধরায় এল বৃদ্ধ। পলক ফেলল চোখের।

নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা। 'আমি আপনার মতামতের অপেক্ষায় আছি।'

'লেসলির কাহিনী সত্যি।'

'সত্যি?' মনে মনে আশ্বস্ত হলো মাসুদ রানা। যেন লেসলি খাঁটি প্রমাণিত হওয়ায় ওর-ই বিজয় ঘটেছে।

'হ্যাঁ। তবে আংশিক।'

'মানে?' বেকুব বনে গেল ও।

'আংশিক সত্যি।'

'কোনটা সত্যি নয়?'

'সেটা জানতে হলে কষ্ট করে আরেকবার আপনাকে লণ্ডন যেতে হবে,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল বৃদ্ধ। আনমনে রানার অস্ত্রটা নাড়াচাড়া করছে।

'লণ্ডন?'

'হ্যাঁ। আমার মনে হয়, এবারের যাত্রাটা খুব উপভোগ করবেন আপনি।'

'বুঝলাম না।'
'আপনি আগ্রহী?'
'কিন্তু কেন? গোলমালটা কোথায় আপনার বলতে অসুবিধে কি?' সন্দিহান হয়ে উঠল মাসুদ রানা।
'অসুবিধে আছে।'
চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। ভাবছে।
'ওয়েল!' খানিক অপেক্ষা করে বলল ম্যাকঅ্যাডাম। 'হ্যাঁ, কি না?'
তবু মুখ বুজে বসে থাকল মাসুদ রানা।
'আপনার ভাল হবে জেনেই আরেকবার লণ্ডন যেতে বলছি আমি আপনাকে, মাসুদ রানা। অনেক উপকার হবে আপনার। ওখানে একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তাহলেই বুঝবেন আমার কথার সত্যতা।'
'কে সে? কার সঙ্গে দেখা করতে হবে?'
'পিটার হোয়াইটসাইড।' মুহূর্তখানেক রানাকে পর্যবেক্ষণ করল সে। 'আপনার সব প্রশ্নের উত্তর তাঁর কাছেই পাবেন আপনি।' একটা কাগজে দ্রুত কিছু লিখে সেটা এগিয়ে দিল লোকটা রানার দিকে। 'এতে হোয়াইটসাইডের ফোন নম্বর, বাসার ঠিকানা আছে। নিন।'
আসন ছেড়ে উঠে এল মাসুদ রানা। চোখ বোলাল কাগজটায়। 'কিন্তু...'
'আর একটা কথাও নয়!' আবার কঠোর হয়ে গেল মানুষটা হঠাৎ করেই। 'সব প্রশ্নের উত্তর লণ্ডন গেলে পাবেন আপনি। নাউ, স্যার...।' মুখ ঘুরিয়ে দরজা দেখাল জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম। বাড়িয়ে দিল ওর পিস্তলটা।

দুপুর আড়াইটায় হিথ্রোর সাত নম্বর রানওয়েতে অবতরণ করল ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের জেনেভা-লণ্ডন রুটের অতিকায় এয়ারবাস। দিনটা ভীষণরকম ঠাণ্ডা। তবে কুয়াশা নেই, একদম পরিষ্কার। কনভেয়র বেল্টের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা নিজের ব্যাগেজের দেখা পাওয়ার আশায়। এমন সময় ওর পাশে এসে দাঁড়াল ছোটখাট এক পাহাড়।
ছয় ফুট চার ইঞ্চি দীর্ঘ হবে মানুষটা। পাশে কাঁধ থেকে নিচ পর্যন্ত সর্বত্র সমান, কম করেও বেয়াল্লিশ। তবে থলথলে নয়, একেবারে পাকানো নারকেলের রশি। চোখের নিচের অংশ দেখার উপায় নেই তার, কারণ সারামুখ অত্যন্ত ঘন, কুচকুচে কালো দাড়িতে ঢাকা লোকটার। কাটে-ছাঁটে না বোধহয়। বন-জঙ্গলের মত লাগে দেখতে।
'মিস্টার মাসুদ রানা?' বলে উঠল সে।
চোখ কুঁচকে ঘুরে তাকাল ও। চোখে প্রশ্ন।
'আমি রজার্স হান্টার। মেট্রোপলিটান পুলিস ডিপার্টমেন্ট।'
কাঁধ ঝাঁকিয়ে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করল মাসুদ রানা। 'আমি নিরপরাধ, অফিসার।'
'মিস্টার পিটার হোয়াইটসাইডের নির্দেশে আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি আমি, স্যার।'

'কোন প্রয়োজন নেই, অফিসার। আমি নিজেই যেতে পারব।'

'তাতে কোন সন্দেহ নেই,' গম্ভীর গলায় বলল জঙ্গল। 'কিন্তু জর্জ ম্যাকঅ্যাডামের মুখে আপনার আগমনের খবর পেয়ে উনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। হাই অফিশিয়ালের নির্দেশ না মেনে আমার উপায় নেই। সঙ্গে আরও দু'জন আছে আমার।'

'তিনি আপনার হাই অফিশিয়াল?' খানিকটা বিস্মিত হলো মাসুদ রানা। 'কিন্তু আমি তো জানতাম অনেক আগেই অবসর নিয়েছেন তিনি।'

'এখনও অবসরেই আছেন তিনি, স্যার,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলল লোকটা। 'বুড়ো বয়সে নতুন করে সরকারের লাঙল কাঁধে নেয়ার কোন ইচ্ছেই নেই তাঁর। কিন্তু তারপরও তিনি আমার হাই অফিশিয়াল।'

'আই সী!' বেখেয়াল হয়ে পড়ার সুযোগে পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল রানার সুটকেস, লাফিয়ে উঠে সেটা ধরল ও। 'কিন্তু যদি আমি আপনার সঙ্গে যেতে রাজি না হই, অফিসার?'

চেহারা করুণ হয়ে উঠল বন-জঙ্গলের। 'আমি ইনসিস্ট করছি, স্যার।'

'তারপরও যদি প্রত্যাখ্যান করি?'

'তাহলে গ্রেফতার করে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমি মনে করি না আপনি এমন এক বাজে কাজে বাধ্য করবেন আমাকে।'

মধুর হাসি ফুটল রানার মুখে। 'আমি ওটাই জানতে চাইছিলাম।'

'জানা তো হলো, স্যার। এবার তাহলে যাওয়া যাক?'

'নিশ্চই!' ডান হাতটা বাড়াল মাসুদ রানা। 'তার আগে আপনার পরিচয় পত্রটা দেখতে চাই।'

এক হাত সুড়ুৎ করে ট্রাউজারের পকেটে সেঁধিয়ে দিল হান্টার। ছোট একটা কার্ড এবং একটা ব্যাজ বের করে আনল। জিনিস দুটো দেখামাত্র বুঝল রানা, একদম খাঁটি। কোন ভেজাল নেই। 'সন্তুষ্ট, স্যার?'

'পুরোপুরি।'

'তাহলে চলুন, যাই!' ডান হাত বাড়াল হান্টার। 'আপনার সুটকেসটা দিন আমাকে।'

'ধন্যবাদ। তার কোন প্রয়োজন নেই।'

## আট

পুলিসের ছাপহীন একটা ডার্ক ব্লু রোভারের পিছনের আসনে তোলা হলো মাসুদ রানাকে হান্টার বসল ওর পাশে। অন্য দু'জন বসল সামনের আসনে, ওর মধ্যে একজন চালক। মোটরওয়ে ধরে লণ্ডনের দিকে ছুটল রোভার।

সরাসরি শহরের মধ্যে ঢুকল না গাড়ি। পাশ কাটিয়ে ভিক্টোরিয়া স্টেশনের দিকে চলল। স্টেশনের সামান্য আগে বাঁয়ে বাঁক নিল রোভার। আরও তিন মিনিট চলল, তারপর বেলগ্রাভিয়ার এক টাউনহাউসের সামনের কার্ব ঘেঁষে দাঁড়িয়ে

পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে প্রায় বাঁদরের মত লাফিয়ে বেরিয়ে গেল হান্টার, ঘুরে এপাশে এসে দরজা মেলে ধরল মাসুদ রানার জন্যে। 'আসুন।'

নামল মাসুদ রানা। বাড়িটার দিকে তাকাল। এটাও জর্জ ম্যাকঅ্যাডামের ভিলার মত, কোথাও মালিকের নাম-ঠিকানা কিচ্ছু নেই। তবে ডোরবেল আছে। ওটায় চাপ দিল হান্টার, এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ঘটাং করে খুলে গেল লোহার গেট। কঠোর চেহারার দুই সাদা পোশাকধারী দেখল ওদের, তারপর ইশারায় ঢুকে পড়তে বলল। হান্টারের সাথে এগোল মাসুদ রানা, ওদিকে রোভারের চালক পিছন পিছন আসছে ওর সুটকেস নিয়ে।

একটা প্রায় গোল রুমে নিয়ে আসা হলো ওকে। রুমটার এক দেয়ালে ঝুলছে ইংল্যাণ্ডেশ্বরীর প্রকাণ্ড এক পোর্ট্রেট। ওটার উল্টোদিকে স্ট্যাণ্ডার্ডে দাঁড়িয়ে আছে ইউনিয়ন জ্যাক। ওটা পেরিয়ে মেরুন রঙের পুরু কার্পেট মোড়া এক প্রকাণ্ড হলরুমে নিয়ে আসা হলো রানাকে। চারদিকে তাকিয়ে স্থির বিশ্বাস জন্মাল ওর, এটা নিঃসন্দেহে এডওয়ার্ড আমলের টাউনহাউস। সম্ভবত গোপনে সরকারী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। ওটাও পেরিয়ে এল ওরা। ছোট একটা অফিসরুমে এসে ঢুকল। কোন জানালা নেই এটায়।

পুরু ইরানী গালিচার ওপর একদিকে এক সেট নরম গদির সোফা, আরেক দিকে একটা আর্মচেয়ার এবং একটা কাঠের সেক্রেটারিয়েট টেবিল, এ ছাড়া আর কোন আসবাব নেই এ রুমে। সোফা ইঙ্গিত করল হান্টার। 'বসুন, প্লীজ। আমি খবর দিচ্ছি মিস্টার হোয়াইটসাইডকে।'

এক মিনিটও হয়নি আসন নিয়েছে মাসুদ রানা, ঘরে এসে ঢুকল দীর্ঘ, ঋজু এক বৃদ্ধ। অত্যন্ত সুদর্শন, হ্যাণ্ডসাম মানুষ। সেভিল রো-র নিখুঁত ছাঁটের পিন-স্ট্রাইপড্ সুট তার পরনে। পঁচাত্তরের কম হবে না বৃদ্ধের বয়স, অনুমান করল রানা, অথচ ষাটের বেশি মনেই হয় না। চাউনি খুবই তীক্ষ্ণ। এবং ধূর্ত। মাসুদ রানাকে দেখল মানুষটা কয়েক মুহূর্ত। তারপর হাসিমুখে ডান হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমি পিটার হোয়াইটসাইড। ভ্রমণ উপভোগ করেছেন নিশ্চই?'

হাত মেলাল রানা। 'কোন্ ভ্রমণের কথা বলছেন? জেনেভা-লণ্ডন, না হিথ্রো-বেলগ্রাভিয়া?'

আর্ম চেয়ারটায় বসল হোয়াইটসাইড। পর্যবেক্ষণ করতে লাগল মাসুদ রানাকে। 'দুটোই বোঝাতে চাইছি আমি।'

'মন্দ নয়। ভালই।'

মাথা দোলাল হোয়াইটসাইড। 'ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে ভ্রমণের জন্যে ধন্যবাদ।'

'আমাকে এভাবে ধরে আনার কি প্রয়োজন ছিল?'

'আপনি বিপজ্জনক মানুষ, দুই দশকেরও বেশি আগে মৃত একজনকে জ্যান্ত করে তুলেছেন, যে জন্যে···ইউ নো, সত্যিই যদি আপনাকে ধরে আনা প্রয়োজন মনে করতাম আমি, জেনেভাতেই তা করতে পারতাম, কিন্তু করিনি। আপনি তো আমার কাছেই আসতে চেয়েছিলেন, তাই না? কিছু প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্যে। গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। সে জন্যেই এয়ারপোর্টে পাঠিয়েছি আমি ওদের। ইন ফ্যাক্ট

আপনাকে এসকর্ট করে নিয়ে আসার জন্যে। আপনার "ধরে আনার" সঙ্গে আমি একমত নই।'

'আমাকে অ্যারেস্ট করা হয়নি তাহলে?' নিশ্চিত হতে চাইল রানা।

চোখ কপালে তুলল বৃদ্ধ। 'অ্যারেস্ট! প্রশ্নই আসে না। আপনি মুক্ত, মাসুদ রানা। ইচ্ছে হলে এই মুহূর্তে চলে যেতে পারেন, প্রয়োজনে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসব আমি আপনাকে। কিন্তু আপনি তা করবেন বলে আমি মনে করি না। অন্তত এখনই নয়। গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্নের উত্তর জানা আপনার প্রয়োজন। ঠিক কি না?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'হ্যাঁ।'

'তাহলে রিল্যাক্স করুন, প্লীজ। আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে কিছু জানতে বুঝতে বাকি আছে আপনার। অনেক কিছু। আমি আপনাকে সে সম্পর্কে অবহিত করতে পারব। ইয়ে···কফি?' জানতে চাইল বটে হোয়াইটসাইড, কিন্তু ওর 'হ্যাঁ' বা 'না'র জন্যে অপেক্ষা করল না। ইন্টারকমে দু'কাপ কফির নির্দেশ পাঠিয়ে দিল সে।

নীরবে কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। কফি দিয়ে গেল রোভারের ড্রাইভার লোকটা।

'এবার তাহলে শুরু করা যাক,' বলল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, যাক,' বলে খানিক বিরতি দিল পিটার হোয়াইটসাইড। বক্তব্য গোছাচ্ছে মনে মনে। 'আমি রিটায়ার্ড, মিস্টার রানা। প্রায় দুই দশক হতে চলল অফিশিয়ালি অবসর গ্রহণ করেছি। আমার চাকরি জীবনের শেষ দিকে, ১৯৬৯-এর মাঝামাঝি সময় আর্থার স্যান্ডলার-জর্জ ম্যাকঅ্যাডাম সমস্যা সমাধানের ভার আমার কাঁধে চাপে। বড্ড নোংরা সমস্যা, স্বীকার করতেই হবে আমাকে। আমার···· কি বলব! সেকশন? হ্যাঁ, তাই। আমি ছিলাম এম আই-সিক্সের চ্যান্সেলারি অভ দ্যা এক্সচেকার সেকশনের হেড। অথবা ট্রেজারি সেকশন, যেটা সহজ মনে হয় আপনার।'

'মানি,' মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

'কারেন্সি। হ্যাঁ, এটাই উপযুক্ত হয়। তো, কারেন্সি সেকশনের হেড থাকার সময় আর্থার স্যান্ডলারের কেস সুরাহার ভার পড়ে আমার ওপর।'

'কারেন্সি ম্যানিপুলেশন?'

চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল হোয়াইটসাইডের। 'রাইট, স্যার।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'কোথায় যেন শুনেছিলাম ব্যাপারটা,' বলল ও চিন্তিত ভঙ্গিতে। 'মনে পড়ছে না।'

'মনে করার চেষ্টা চালিয়ে যান, দয়া করে। ইউ সী? আর্থার সম্পর্কে আপনার সব প্রশ্নের জবাব দেব আমি। এবং তারপর, আমারও এক-আধটা প্রশ্নের উত্তর আপনি দেবেন।'

দু'হাতের তালু উল্টে 'আপনি কি বলছেন, বুঝতে পারছি না' ধরনের একটা ভঙ্গি করল মাসুদ রানা। দেখেও পাত্তা দিল না বৃদ্ধ। 'ওই কথাই রইল তাহলে?' কফি শেষ করে সুগন্ধি ক্যানারি আইল্যাণ্ড চুরুট ধরাল সে। মাসুদ রানা ধরাল

সিগারেট।

'আর্থার স্যাণ্ডলারকে আপনি জানেন সম্ভবত একজন ধনকুবের শিল্পপতি, অর্থ লগ্নিকারী হিসেবে। এবং সম্ভবত একজন মাস্টার অভ কেমিস্ট্রি হিসেবে। তাই তো?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'কিন্তু সে যে আসলে কতবড় এক সিঙ্গুলার স্কিল ছিল এনগ্রেভিং শিল্পে, ধারণাই করতে পারবেন না আপনি। ওই লাইনে মুকুটহীন সম্রাট ছিল লোকটা।'

'এনগ্রেভিং?'

'ভদ্র ভাষায় তাই। অভদ্র ভাষায়, মানে সহজবোধ্য উপযুক্ত ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় ফরজার, অথবা জালিয়াত। কাউন্টারফিটার।'

চুপ করে বৃদ্ধের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকল মাসুদ রানা। খানিকটা বিভ্রান্ত

'অপারেশন বার্নহার্ডের নাম শুনেছেন আপনি?' ধূর্ত চোখে রানাকে পর্যবেক্ষণ করছে হোয়াইটসাইড।

খানিক মাথা খাটাল রানা নামটা নিয়ে। 'না।'

'স্যাশেনহসেন?'

কাঁধ ঝাঁকাল ও।

'হেলমুট অ্যানডরফার? অথবা হেইনরিখ কিণ্ডার?'

'না।'

'ঠিক আছে। আপনার জ্ঞানের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে দেব আমি, চিন্তা নেই। তবে সে জন্যে ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে আপনাকে, স্যার। ১৯৩৯ সালে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটিয়েছিল জার্মানি, সেটা শুধুই সামরিক ছিল না। ছিল আরও অনেক কিছু। অনেক ব্যাপক। ব্রিটিশ জাতিকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল হিটলার। সামরিক যুদ্ধ তো বটেই, একই সময়ে সুদূর প্রসারী এক অর্থনৈতিক যুদ্ধও শুরু করে সে আমাদের বিরুদ্ধে। পরেরটার নাম দিয়েছিল ওরা বার্নহার্ড। অপারেশন বার্নহার্ড।'

নড়েচড়ে, খানিকটা কাত হয়ে বসল পিটার হোয়াইটসাইড। পায়ের ওপর পা তুলে দিল।

'অপারেশন বার্নহার্ড ছিল ওদের হাইলি সিক্রেট প্রজেক্ট। প্রজেক্টের মূল কাজ ছিল ব্রিটিশ পাউণ্ড, বিশেষ করে পাঁচ পাউণ্ডের নোট জাল করে বাজারে ছাড়া। দশ ও বিশ পাউণ্ডের নোটও জাল করত ওরা, তবে কম। পাঁচ পাউণ্ড ছিল ওদের মূল আক্রমণের লক্ষ্য। বৃষ্টির মত বাজারে জাল পাউণ্ড ছেড়ে ব্রিটিশ অর্থনীতিকে প্রায় পর্যুদস্ত করে দিয়েছিল জার্মানি।

'অত্যন্ত সূক্ষ্ম বুদ্ধির ধূর্ত এক এস এস কর্নেল, হেলমুট অ্যানডরফারকে দেয়া হয় এ অপারেশনের দায়িত্ব। যুদ্ধ শুরুর কিছুদিনের মধ্যে। ১৯৪০ সালে প্রজেক্টের নীল নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করে হিটলারের অনুমোদনের জন্যে ফাইল সাবমিট করে অ্যানডরফার। এবং খুশি মনে অনুমোদন দেয় হিটলার। এরপর শুরু হয় আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার কাজ।'

'ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়া,' মন্তব্য করল মাসুদ রানা।

'নিঃসন্দেহে,' মাথা দুলিয়ে সায় দিল বৃদ্ধ।

'ইতিহাস বলে, এ কাজ আপনারাও করেছিলেন আমেরিকার বিরুদ্ধে। যখন মার্কিনীরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করে, ওদের কন্টিনেন্টাল ডলার জাল করে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায় হাঁটুর ওপর বসিয়ে ছেড়েছিলেন আপনাদের জেনারেল হাও। অবশ্য শেষ রক্ষা করতে পারেননি আপনারা।'

'ঠিক।' আবার মাথা দোলাল হোয়াইটসাইড। তবে চেহারার অসন্তুষ্টি চাপা থাকল না তার। 'তবে আপনি নিশ্চই স্বীকার করবেন যে জেনারেল হাও-র জাল নোটগুলো একেবারে নিখুঁত, বরং বলা ভাল, আসল ডলারের চাইতেও ভাল ছিল?'

'ছিল। তবু আমেরিকার বিজয় ঠেকানো সম্ভব হয়নি।'

'তা-ও সত্যি।' নাকের ডগা চুলকাল লোকটা। 'সে যা হোক, অ্যানডরফার কিন্তু অর্থনীতির ছাত্র ছিল না, ছিল ইতিহাসের ছাত্র। তবু তাকে বার্নহার্ডের দায়িত্ব দেয়া হয়, কারণ লোকটা ছিল ফরমিডেবল স্ট্র্যাটেজিস্ট এবং একসেলেন্ট সৈনিক। প্রজেক্টটা যখন হিটলার অনুমোদন করে, তখন তার প্রয়োজন হয় একজন এনগ্রেভারের।'

'এবং জার্মান ইন্টেলিজেন্সের মধ্যেই ছিল নিশ্চই তেমন এক এনগ্রেভার, আর্থার স্যান্ডলার? আপনার সেই সিঙ্গুলার স্কিল!'

'ঠিক ধরেছেন,' হাসল বৃদ্ধ। 'আর্থার স্যান্ডলার। জার্মান স্পাই বাহিনীতে যাকে সবাই চিনত হেইনরিখ কিণ্ডার নামে। সে-ই ছিল অ্যানডরফারের এনগ্রেভার। প্লেট এনগ্রেভিং ও পাউন্ডের কাগজ ডুপ্লিকেটিং-এ সুপার সুপার মাস্টার। তার প্রোডাক্ট ছিল প্রশ্নাতীত রকম খাঁটি। এ ক্ষেত্রে জেনারেল হাও-কে বহু মাইল পিছনে ফেলে দিয়েছিল সে। বহু মাইল।

'আর্থার স্যান্ডলার, আমাদের ডিয়ার ডিয়ার আমেরিকান ডাবল এজেন্ট। বহুমুখী প্রতিভা। আপনি জানেন, সে কেমিস্ট ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে অত্যাধুনিক প্রিন্টিং মেশিন দিয়ে জাল পাউন্ড ছাপার কাজে লাগিয়ে দেয় অ্যানডরফার। আর সে কী এক ব্লীচ আবিষ্কার করে, যার সাহায্যে আমাদের এক পাউন্ড নোটের প্রিন্ট সম্পূর্ণ তুলে ফেলা হত, পাউন্ড পরিণত হত সাদা কাগজে। স্রেফ সাদা কাগজে। ওই কাগজ মেশিনে দিয়ে মণ্ড তৈরি করত স্যান্ডলার, তারপর সেই মণ্ড থেকে আবার তৈরি করা হত পাঁচ পাউন্ড নোটের আকারের কাগজ। আর তাই দিয়ে দিন-রাত নকল পাঁচ পাউন্ড ছাপা হতে থাকল। বেচারা প্রেস, বিশ্রাম পেত না মোটেই। দিন-রাত কেবল ঘটাং-ঘটাং, ঘটাং-ঘটাং। আমাদের কাজিন আমেরিকা। বিরাট সাহায্য করে হিটলারকে এ কাজে, স্যান্ডলারকে কিন্ডার বানিয়ে ওদেশে পাঠিয়ে।'

'কি পরিমাণ ক্ষতি করতে সক্ষম হয় স্যান্ডলার?'

'যুদ্ধের সময়, খুব সামান্যই। এতবড় এক অপারেশন, পুরোপুরি চালু হতে অনেক সময় লাগাই স্বাভাবিক। স্যান্ডলার, বা কিন্ডারের এই প্রেস ছিল স্যাশেনহসেন কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। সমস্ত মাল-মশলা টুলস্ ইত্যাদি জোগাড় করে পুরোদমে কাজ আরম্ভ করতেই সময় গড়িয়ে যায়। ১৯৪৪ সালের প্রায়

শেষের দিকে শুরু হয় অ্যানডরফারের প্রজেক্ট বাস্তবায়নের কাজ।'

'যুদ্ধ তখন প্রায় শেষ,' আরেকটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ। সব ফ্রন্ট থেকে পিছু হটছে তখন জার্মান বাহিনী। পাউন্ড সংগ্রহের তিনটি চ্যানেল ছিল অ্যানডরফারের, সুইটজারল্যান্ড, উত্তর আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকা। কোন চ্যানেলই পর্যাপ্ত এক পাউন্ড নোট পাঠাতে পারছিল না প্রয়োজনের সময়ে। এ ছিল অনেকটা আমেরিকানদের অ্যাটম বোমার কার্যকরিতা চাক্ষুষ করার স্থান নির্বাচনের সমস্যার মত। যুদ্ধ শেষ হয়ে যাচ্ছে দ্রুত, অথচ বোমাটা ফেলার মত জায়গা খুঁজে পাচ্ছে না ওয়াশিংটন, তেমনি। সব প্রস্তুত, অথচ কাজের কাজ হচ্ছে না, বেশ সমস্যাই হয়ে দাঁড়াল ব্যাপারটা জার্মানদের জন্যে। ঠিকমত গেলাতে পারছে না আমাদের নকল পাউন্ড, আবার এত ব্যাপক প্রস্তুতির পর বসে থাকতেও পারছে না।'

'আসল সমস্যাটা বলুন প্লীজ। মানে পরের সমস্যা।'

'বলছি। ১৯৪৫-এর প্রথম দিকেই থার্ড রাইখের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। প্রশ্নাতীত ভাবে। চারদিক থেকে আক্রমণ চলছে বার্লিনের ওপর। শহরটির পতন তখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।'

লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের কথা মনে হলো মাসুদ রানার। তার বক্তব্য অনুযায়ী বোঝা যায়, নকল পাউন্ড প্রস্তুতের প্রেস যখন সম্পূর্ণ রেডি, তখনই এক্সিটার যায় আর্থার স্যান্ডলার, এবং এলিজাবেথের সঙ্গে তার পরিচয় হয়।

'নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে আরম্ভ করে তখন রাইখ,' বলে চলেছে পিটার হোয়াইটসাইড। 'হিটলার তারও অনেক আগেই গিয়ে আশ্রয় নেয় তার গোপন এবং দুর্ভেদ্য আস্তানা "আলপেনফেসটুঙে"। এ সময়ে যুদ্ধের সত্যিকার গতি-প্রকৃতির ব্যাপারে আসলে কোন ধারণাই ছিল না তার। গর্তে বসে শিশুদের যুদ্ধে যাওয়ার নির্দেশ দিত সে, এমন সব ব্যাটালিয়ানের জন্যে অর্ডার ইস্যু করত, যে সব ব্যাটালিয়ান বহু আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে হেইনরিখ কিন্ডারকেও তার কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিতে থাকে হিটলার, অবশ্যই।'

'নির্দেশ পালিত হয় নিশ্চই?'

'নিঃসন্দেহে।' হাসির ভঙ্গি করল হোয়াইটসাইড।

'তারপর?'

'চলতে থাকে কিন্ডারের কর্মকাণ্ড। বলশেভিক ভায়ারা যখন বার্লিন দখল করে ফেলে, তখনই ক্ষ্যান্ত দেয় সে।'

'তারপর?'

'পুরো প্রিন্টিং ইউনিট নিয়ে স্যান্ডলার ও অ্যানডরফার পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সব কিছু রি-প্যাক করে ট্রাক বোঝাই করে অস্ট্রিয়া চলে যায় ওরা। আই মীন, যাওয়ার চেষ্টা করে। এবং তখনই বিষয়টা জানাজানি হয়ে যায়।'

'কি ভাবে?'

'ওদের মেইন ট্রাক, যেটায় প্রেসের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি ছিল, অসংখ্য ক্রেট বোঝাই সদ্য ছাপা পাঁচ পাউন্ডের নোট এবং টাকা ছাপানোর প্লেট ইত্যাদি ছিল, পথের মাঝে এক পাহাড়ের ওপর, মারাত্মক যান্ত্রিক ত্রুটির জন্যে অচল হয়ে

পড়ে। ফলে বিপদে পড়ে যায় ওরা। এত মূল্যবান জিনিসপত্র ফেলে যেতেও পারে না, আবার নিয়েও যেতে পারে না। কি করে এ সমস্যার সমাধান করা যায় ভাবতে লাগল স্যান্ডলার-অ্যানডরফার। অবশেষে ট্রাকটা লুকিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ওরা। পাহাড়টার নিচেই ছিল একটা লেক। ব্রেক রিলিজ করে অচল ট্রাক গড়িয়ে দিল স্যান্ডলার, মালপত্রসহ লেকে গিয়ে পড়ল ওটা, তলিয়ে গেল পানির নিচে।'

'এবং চাপা পড়ে গেল বিষয়টা,' বলল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ। কয়েক সপ্তার জন্যে। একদিন পানির নিচে ভেঙে গেল টাকার ক্রেটগুলো মিলিয়ন মিলিয়ন পাউন্ড ভেসে উঠল ওপরে। পাঁচ, দশ, বিশ এমনকি পঞ্চাশ পাউন্ড নোটও ছিল ওর মধ্যে। নতুন ছাপা। ঝকঝকে নিখুঁত প্রিন্ট। জাল বলে ধরে কার সাধ্য?' মৃদু হাসি ফুটল হোয়াইটসাইডের মুখে। 'সময়টা স্থানীয়দের বড় আনন্দে কেটেছে। লেক থেকে গাম্রি গাম্রি টাকা তুলে মাটিতে ফেলে শুকিয়েছে, আর চোখ বুজে খরচ করেছে। ঘটনাটা কানে আসে অ্যালায়েড ইন্টেলিজেন্সের। আসারই কথা, এমন এক গরম খবর কি চাপা থাকে? ফাঁস হয়ে যায় অপারেশন বার্নহার্ড।'

ভুরু কুঁচকে মন দিয়ে হাতের তালু পরখ করল খানিক পিটার হোয়াইটসাইড 'নানারকম সন্দেহ দেখা দেয়। এবং বলা বাহুল্য মারাত্মকরকম ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাউন্ড স্টার্লিং। হঠাৎ করে এত বেড়ে যায় পাউন্ডের সার্কুলেশন যে রীতিমত কপালে উঠে যায় আমাদের চোখ। খোঁজ-খবর করতে শুরু করলাম আমরা, বাজেয়াপ্ত করলাম ওই এলাকার সমস্ত পাউন্ড নোট। তারপর টের পেলাম কি ঘটে গেছে।'

'আর স্যান্ডলার?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। উত্তর কি হবে বৃদ্ধের, তার কিছুটা আন্দাজ করে ফেলেছে আগেই। 'অ্যানডরফার?'

চেহারায় বিশেষ এক ভঙ্গি ফোটাল বৃদ্ধ, একই সাথে ভেংচি কাটা ও দুঃখ পাওয়ার হাসি, দুটোই বোঝাল তাতে। 'এখানেই জটিল হয়ে উঠল ব্যাপারটা। হেইনরিখ কিন্তার পালিয়ে গেল বটে, তবে তার ...ক...'

'ধরা পড়ল?' জানতে চাইল ও।

'এক সেন্সে, হ্যাঁ।'

'বুঝলাম না।'

'মৃত পাওয়া গেল অ্যানডরফারকে। অস্ট্রিয়ার প...দের মাইল পুবে পাওয়া গেল অপারেশন বার্নহার্ডের জনককে। একটা ডিচের মধ্যে পড়ে আছে তার লাশ।' নির্বিকার, একঘেয়ে কণ্ঠে বলে যেতে লাগল প্রাক্তন চ্যান্সেলারি অভ দ্যা এক্সচেকার সেকশন চীফ, পিটার হোয়াইটসাইড। যেন ক্রিকেটের স্কোর অথবা আবহাওয়া বুলেটিন পড়ছে। 'ডিচের কাদাপানির মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে হেলমুট অ্যানডরফারের গলা কাটা লাশ।'

'গলা কাটা?'

'হ্যাঁ। এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত। শুধু কণ্ঠার হাড় দেহ থেকে তার মাথার বিচ্ছিন্ন হওয়া ঠেকিয়ে রেখেছিল।'

'আর স্যান্ডলার?'
'তাকে পাওয়া যায়নি
'আই সী!'
'আমরা যখন লেক থেকে ট্রাকটা তুলে আনলাম, দেখা গেল কয়েকটা আইটেম নেই। নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নিয়ে গেছে স্যান্ডলার।'
'কি কি?'
'মূল হচ্ছে প্লেটগুলো। পাউন্ড জাল করার এনগ্রেভড প্লেট।'
আগেই অনুমান করেছিল মাসুদ রানা। মাথা নাড়ল ওপর-নিচে। 'বুদ্ধিমানের কাজ '
ভুরু কুঁচকে সামনে বসা যুবককে লক্ষ করতে লাগল হোয়াইটসাইড। 'এবার,' বলল সে। 'দেখা যাক, আমাদের গোয়েন্দা মাসুদ রানা কতটা সাবালক। নাকি এখনও নাবালকই রয়ে গেছে সে। বলুন দেখি, আমার গল্পে এমন এক পয়েন্ট ছিল, সেটা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি বেখাপ্পা। সেটা কোনটা?'
মুচকে হাসল মাসুদ রানা। 'অ্যানডরফারের লাশ পুবে আবিষ্কৃত হওয়া। আর্থার স্যান্ডলার সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি, তাতে তার পুবে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব মনে হয়।'
'এগজ্যাক্টলি!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বৃদ্ধ। প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দিল ডেস্কে। 'ঠিক ধরেছেন আপনি। একদম ঠিক। ইস্ট হ্যাজ মেড নো সেন্স অ্যাট অল কেন, সেটা একবার ভেবে দেখা যেতে পারে।'

নীরবে কফি পান করতে লাগল মাসুদ রানা ও পিটার হোয়াইটসাইড। কথা নেই কারও মুখে। কফি শেষ করে একজন চুরুট, আরেকজন সিগারেট ধরাল। খালি কাপ দুটো ফিরিয়ে নিয়ে গেল রোভার চালক এসে।
'যা বলছিলাম, মিস্টার রানা,' শুরু করল হোয়াইটসাইড। 'ব্যাপারটা ছিল একেবারেই দুর্বোধ্য। ভেবেই পাচ্ছিলাম না তার এ আচরণের কারণ। এক টপ আমেরিকান এজেন্ট, যে যুদ্ধের প্রায় পুরোটা সময় শত্রুর লাইনে ঘুরঘুর করে খবর সংগ্রহ করে বেড়িয়েছে, যে জার্মানি আর অস্ট্রিয়ার মধ্যে চরে বেড়িয়েছে বছরের পর বছর, যে মানুষ জার্মান ইন্টেলিজেন্সের ভেতর মিশে গিয়ে কয়েক বছর ধরে বহু মূল্যবান তথ্য সরবরাহ করেছে মার্কিনীদের, জার্মান সামরিক-বেসামরিক সমস্ত বিষয়ে–সেই মানুষ-ই কি করল যুদ্ধ শেষে? একশো আশি ডিগ্রি ঘুরে ভুল পথে এগিয়ে গেল সে প্রভুর লাশ পিছনে ফেলে। কোথায় গেল সে? তার কি আমেরিকায় ফিরে আসা উচিত ছিল না?'
চোখমুখ কুঁচকে কাঁধ ঝাঁকাল হোয়াইটসাইড। 'তা না করে রাশিয়ানদের কোলে চড়ে নাগরদোলা খাওয়ার জন্যে মস্কো চলে গেল আর্থার স্যান্ডলার। পরে আমরা জানতে পারি এক মাসেরও বেশি কাটায় সে মস্কোয়।'
চিন্তিত কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা, 'হয়তো কোন কারণ ছিল!'
'ছিল নিশ্চই!' চোখ পাকাল হোয়াইটসাইড 'অবশ্যই ছিল! এবং একটা দুটো নয়, অনেকগুলো কারণ ছিল এর একটা কারণ, আমাদের ফরেন অফিসের

মতে, আর্থার স্যান্ডলার অনেক আগে থেকেই ছিল রুশ এজেন্ট। আমেরিকানরা আসলে এক বলশেভিক এজেন্টকে ভুল করে রিক্রুট করে ১৯৪১ সালে এমন একজনকে রিক্রুট করে খুশিতে বগল বাজাচ্ছিল আঙ্কেল স্যাম যে অনেক আগেই নিজের আত্মা বিক্রি করে দিয়েছিল মস্কোর কাছে। ডেডিকেটেড কমিউনিস্ট ছিল আসলে স্যান্ডলার।'

'বলেন কি?' বিস্মিত হলো মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ শুনতে যতই অসম্ভব, অবিশ্বাস্য ইত্যাদি মনে হোক না কেন, আসলে ঘটনা সত্যি। ওয়াশিংটন ভেবেছে আর্থার তাদের এজেন্ট, ডবল এজেন্ট জার্মান ইন্টেলিজেন্সে ঢুকে তাদের হয়ে খবর সংগ্রহ করছে। সেটাও অবশ্য মিথ্যে নয়; যথেষ্ট গোপন তথ্য জানিয়েছে সে ওয়াশিংটনকে। কিন্তু আসলে ওই সময়ে ত্রিমুখী খেলা খেলছিল স্যাণ্ডলার, সুযোগ পেলেই ওয়াশিংটনের গোপন তথ্য মস্কোর গোচরে আনত সে। এই জন্যেই অনুমান করা হয়, যুদ্ধের পর ওদেশে যায় সে। সম্ভবত নতুন নির্দেশ গ্রহণ করতে, এবং নিজের তথ্য ভাণ্ডার উপুড় করে ঢেলে দিয়ে আসতে। ট্রিপল এজেন্ট ছিল আর্থার স্যান্ডলার।'

'অচিন্তনীয়!' মৃদু কণ্ঠে, আপনমনে বলল মাসুদ রানা।

'ঠিক, অচিন্তনীয়। তবে অসম্ভব নয়।' চুরুটটা হঠাৎ করেই সম্ভবত বিস্বাদ লেগে উঠল হোয়াইটসাইডের তাড়াতাড়ি অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল সে ওটা। 'ওকে ধরার জন্যে অনেকগুলো ফাঁদ পেতেছি আমরা, কিন্তু ব্যাটা এত চতুর, ধরা দিল না একটাতেও।'

দাঁত বের করে এমন এক ভঙ্গি করল বৃদ্ধ, যেন স্যান্ডলারকে হাতের কাছে পেলে চিবিয়ে খায়। 'হারামজাদা একটা, বুঝলেন? আবার পাউন্ড ছাপতে শুরু করে দিল। আগের বার হয়তো কিছু মাত্রা ছিল, এবার সে সবের কিছুই থাকল না।'

কিছু সময় চোখ বুজে থাকল মাসুদ রানা 'আগের অনুমান পরিষ্কার একটা ছবি হয়ে ফুটে উঠল এবার। অল্প সময়ের মধ্যে আর্থার স্যান্ডলারের কোটিপতি হওয়ার রহস্য বুঝে ফেলেছে ও। অ্যাডলফ জেঙ্গারের বক্তব্যের সঙ্গেও অদ্ভুত মিল আছে এর। তার মতে, যুদ্ধ শেষে আমেরিকায় ফেরার সময় 'এক জাহাজ ডলার' সঙ্গে নিয়ে আসে আর্থার স্যান্ডলার। 'তারপর?'

'এক সময় লোকটা হাওয়া হয়ে গেল। কিছুতেই ট্রেস করতে পারছিলাম না ভাবলাম রাশিয়াতেই বসে আছে হয়তো। কয়েক বছর পর নিউ ইয়র্কে উদয় হলো সে। আই মীন, জনসমক্ষে দেখা গেল স্যান্ডলারকে।'

'কত বছর পর?'

'তা প্রায় সাত-আট বছর হবে।'

'এত বছর ছিল কোথায় লোকটা?'

'সবখানে। আমেরিকায়, রাশিয়ায়, এমনকি ব্রিটেনে পর্যন্ত। ছদ্মবেশ ধারণে জুড়ি ছিল না লোকটার। দেশে দেশে ঘুরে বেড়াত নানান রূপে। এর মধ্যে কয়েকবার জার্মানি এবং অস্ট্রিয়াও গেছে সে, পরে জেনেছি আমরা কখনও এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকত না, ঘোরাঘুরির ওপর থাকত কেবল। প্লেটগুলো সব

সময় সঙ্গে থাকত তার।'

'পাউন্ড ছাপত কোথায় বসে?'

'অবশ্যই আমেরিকায় বসে!' খেঁকিয়ে উঠল হোয়াইটসাইড। 'নইলে আর কোথায়? আমাদের এত বড় বান্ধব আর কে আছে? দিনের পর দিন স্যাম চাচার কোলে বসে এমন কুকর্ম করেছে স্যান্ডলার, অথচ ওরা কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তাকে বিরত রাখার চেষ্টাই করেনি কখনও ওয়াশিংটন।'

'হয়তো...'

'কোন হয়তো-টয়তো নেই, মিস্টার রানা। ওরা জানত সব। জেনেও বাধা দেয়নি।' খানিক বিরতি দিয়ে যোগ করল বৃদ্ধ, 'কারণ পাউন্ডের সার্কুলেশন যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই তার মূল্য পড়তে থাকে। ফলে চাঙা হয়ে উঠতে থাকে ডলার।'

দরজায় টোকার আওয়াজ উঠতে ঘুরে তাকাল বৃদ্ধ। 'কাম ইন।'

ভেতরে এসে ঢুকল দানবসদৃশ রজার্স হান্টার। হাতে একটা হলুদ খাম। ওটা যথেষ্ট সম্ভ্রমের সাথে হোয়াইটসাইডের দিকে এগিয়ে দিল সে। নিল বৃদ্ধ খামটা। ভেতর থেকে বের হলো একটা চিরকুট, চোখ বোলাল সে চিরকুটে, তারপর খামসহ ওটা কোটের সাইড পকেটে ভরে হান্টারের দিকে ফিরল। 'থ্যাঙ্ক ইউ, হান্টার। তুমি যাও।'

চলে গেল লোকটা। নিজের বক্তব্যে ফিরে গেল পিটার হোয়াইটসাইড। 'তো, আমাদের তখনকার অবস্থাটা একবার কল্পনা করুন! আমরা নিশ্চিত, আমাদের অর্থনীতির কবর রচনা করছে স্যান্ডলার আমেরিকার মাটিতে বসে। অথচ আমেরিকার সাহায্য পাচ্ছি না আমরা। কি করতে পারতাম আমরা? একটাই পথ ছিল ওকে ঠেকানোর। বাধ্য হয়ে সে পথেই এগোলাম আমি। নির্দেশ দিলাম, যেখানে যখন পাও, হত্যা করো আর্থার স্যান্ডলারকে। "পুট হিম ডাউন"। নির্দেশটা ব্যক্তিগতভাবে আমিই দিয়েছিলাম সেদিন। এবং আজ আবারও সেই একই নির্দেশ নতুন করে জারি করতে যাচ্ছি আমি।'

'করা উচিত,' অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'প্রথমবার মিস করেছেন আপনারা।'

'হ্যাঁ। এখন জানি। আমরা কল্পনাই করিনি মার্কিন সরকার স্যান্ডলারকে রক্ষা করার জন্যে তার এক নকল বাজারে ছেড়েছিল।' একটু ভাবল বৃদ্ধ। চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'কিন্তু এটাও সত্যি, ওই ঘটনার পর নকল পাউন্ড ছাপার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। লোকটা স্যান্ডলারের ডবল বা ট্রিপল, যা-ই হয়ে থাকুক, তাকে "পুট ডাউনের" ফলে আমাদের আসল উদ্দেশ্য ষোলো আনাই অর্জিত হয়। হতে পারে, ওই ঘটনায় ভয় পেয়ে আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যায় আর্থার স্যান্ডলার বুঝে ফেলে তার পাণ্ডিত্য জাহির হয়ে গেছে। অথবা এ-ও হতে পারে, আর কোন বিষয়ে গ্রাজুয়েট হওয়ার উদ্দেশে প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে সে কোথাও পালিয়ে গিয়ে কে জানে!'

চোখ বুজে কানের লতি ডলতে লাগল বৃদ্ধ দু'আঙুলে। 'আমরা যা চাইছিলাম, ব্রিটিশ পাউন্ড জাল হওয়া বন্ধ করতে, হয়ে গেল। ওটাই ছিল আমার একমাত্র

আকাঙ্ক্ষা। স্যান্ডলারের সাথে ওখানেই, সেই ১৯৬৪ সালেই সম্পর্ক চুকে-বুকে গেছে আমার।'

'একটা পয়েন্ট বোধহয় মিস্ করে গেছেন আপনি,' বৃদ্ধের চোখে চোখ রেখে মৃদু কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

'বুঝলাম না। কোনটা?'

'লেসলি।'

'ও হ্যাঁ! দুঃখিত। ভুলেই গিয়েছিলাম আসল পয়েন্টটা।'

'আমি শুনেছি, বিপদে মেয়েটিকে সাহায্য করেছেন আপনি অনেকভাবে। তার একটা ভাল আশ্রয়ও জুটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না আমি, কেন নয় বছর পর হঠাৎ করে ফিরে এসেছিল লোকটা এক্সিটারে? কেন খুন করল এলিজাবেথকে? অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে লেসলি সেবার নইলে ওকেও তো দিয়েছিল সে শেষ করে। নিজের বউ, মেয়েকে এভাবে কেউ...'

'নিশ্চই কোন কারণ আছে,' বলল হোয়াইটসাইড। 'যদি কোন একটা বিশেষ অ্যাঙ্গেল থেকে দেখা যায় ব্যাপারটাকে, কারণটা হয়তো পাওয়া যাবে।' হাসিমুখে মাথা দোলাতে লাগল বৃদ্ধ আরেক দিকে তাকিয়ে। 'স্যান্ডলার স্যান্ডলার-ই, মিস্টার মাসুদ রানা!' ওর দিকে তাকাল লোকটা হাসি মুছে গেছে। 'একটু ভাবুন, তাহলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।'

ইঙ্গিতটা তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলল মাসুদ রানা। মাথা দোলাল 'ভেবেছি। কিন্তু কেমন যেন মনে হয় আইডিয়াটা। বিশ্বাস হয় না।'

'ওটাই সত্যি। অন্তত আমার তাই ধারণা। নইলে স্যান্ডলারের ফিরে আসার কোন কারণ ছিল না। অন্তত এত বছর পর।'

'অর্থাৎ এলিজাবেথ নিজে তার মৃত্যু ডেকে এনেছিলেন?'

'খুব সম্ভব।' ড্রয়ার থেকে একটা সোনার কমপ্যাক্ট কেস বের করল হোয়াইটসাইড ভেতর থেকে বের হলো অধিবেশনের তৃতীয় ক্যানারি আইল্যাণ্ড সিগার ব্যস্ত হাতে ধরাল সে ওটা। 'সে-ই খুঁচিয়ে জীবিত করে তুলেছিল মৃত অধ্যায়টা, আফটার অল! কিন্তু আজ, এত বছর পর ব্যাপারটা কোন গুরুত্ব বহন করে না, মিস্টার রানা। আমার কাছে অন্তত।'

'কিন্তু তবু, কোথায় যেন একটা ফাঁক রয়ে গেছে বলে মনে হয় আমার বেশ বড় একটা ফাঁক।'

'আছে।' মিটিমিটি হাসছে বৃদ্ধ। 'আপনি যত বড় ভাবছেন, তার চেয়ে অনেক বড় ফাঁক।'

চোখ কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। 'কি রকম?'

চুরুট দাঁতে কামড়ে ধরে দুই হাতের তালু ঘষল খানিক হোয়াইটসাইড অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল। তারপর চট্ করে আসন ছাড়ল 'চলুন, একটা চক্কর দিয়ে আসা যাক।'

'কোথায়?'

'আসুন না! কাছেই। দারুণ একটা জিনিস দেখাব আপনাকে।'

কার্ব ঘেঁষে যেখানে পার্ক করা হয়েছিল, সেখানেই আছে এখনও রোভারটা

হোয়াইটসাইডের পাশে উঠে বসল মাসুদ রানা। হান্টার বসল ড্রাইভিং সীটে, গড়াতে শুরু করল রোভার। তিন মিনিটের মধ্যে লণ্ডনের ঘন ট্রাফিকে ঢুকে পড়ল। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছে। ওয়াইপার চালু করে দিল হান্টার।

বিশ মিনিট পর আর্ল'স কোর্ট ও কেনসিংটনের মাঝামাঝি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। পিছনের দুই আরোহী নেমে এল ভেতর থেকে। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। রাস্তায় ট্রাফিকের চাপ অনেক কম। পথের দু'দিকে ঝাঁকড়া মাথাওয়ালা প্রচুর গাছ। নিজের বাঁ দিকে একটা গির্জা চোখে পড়ল রানার বেশ সাদাসিধে চেহারা, আকারেও ছোট।

'সেন্ট মাইকেল দ্যা রেডীমার চ্যাপেল,' মৃদুকণ্ঠে বলে উঠল হোয়াইটসাইড 'খুব শান্তির জায়গা, মনে হয়।' শ্রাগ করল। 'আমি আসলে ধর্ম-টর্ম তেমন একটা মানি না। তবে কখনও এ ধরনের স্থানে এলে মনটা কেমন যেন হয়ে যায়। ভাল লাগে। আসুন '

বৃদ্ধকে অনুসরণ করে গির্জার ভেতরে ঢুকল মাসুদ রানা। রেক্টরের সঙ্গে চোখাচোখি হলো হোয়াইটসাইডের, মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে পরস্পরকে অভিবাদন জানাল তারা। কোন কথা হলো না। সোজা এসে শেষ প্রান্তের বেদীতে উঠল ওরা দু'জন। বেদী অতিক্রম করে ছোট একটা বন্ধ দরজার সামনে থেমে দাঁড়াল হোয়াইটসাইড। দরজা খুলে আহ্বান জানাল রানাকে, 'চলে আসুন।'

পিছনের দেয়ালঘেরা ছোট এক কবরস্থানে চলে এল ওরা। 'এখানে কেন?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা

'জানেন, লেসলিকে খুব ভালবাসতাম আমি,' খেয়াল করল না বৃদ্ধ, গাঢ় কণ্ঠে বলে চলল, 'প্রাণভয়ে ভীত, আতঙ্কিত ছোট্ট একটি মিষ্টি মেয়ে। আমি বিয়ে করিনি জীবনে কাজেই কোন সন্তানও নেই। কিন্তু লেসলিকে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিন মনে হয়েছে, বোধহয় ভুল করে ফেলেছি বিয়ে না করে। করলে ওর মত একটা কি দুটো মেয়ের বাপ হতে পারতাম। বেশ হত ব্যাপারটা।'

'আপনি এখানে কেন নিয়ে এলেন আমাকে?' কিছুটা কঠিন শোনাল মাসুদ রানার গলা।

'ওটা দেখাতে হাত তুলে একটা সমাধিস্তম্ভ দেখাল বৃদ্ধ। চেহারা অভিব্যক্তিহীন। নিভে গেছে দাঁতে ধরা চুরুট, খেয়াল নেই।

স্তম্ভটার দিকে তাকিয়ে জমে গেল মাসুদ রানা। বড় বড় গথিক অক্ষরে লেখা আছে ওটার গায়ে:

*লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম*
*১৯৬০-১৯৭৮*

লেখাটার দিকে অবিশ্বাস মাখা দৃষ্টিতে দীর্ঘ সময় চেয়ে থাকল রানা। তারপর ঘুরে তাকাল হোয়াইটসাইডের দিকে, নিবিষ্টমনে ওর প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে বৃদ্ধ এইমাত্র যে নিজের ট্রাম্প কার্ড শো করেছে যুবককে, সে ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন মানুষটা।

'এর অর্থ?' প্রায় ফিস ফিস করে বলল মাসুদ রানা।

'অর্থটা খুব সহজ, মিস্টার রানা। পাউন্ড জালকারী আর্থার স্যান্ডলারের এক জাল মেয়েও আছে। লেসলি নেই বটে, তবে তার আর সব ঠিকই আছে। একটি তথ্যও মিথ্যে বা ভুল নয়।'

'আর সব?' বেকুবের মত তার মুখের দিকে তাকিয়েই থাকল রানা।

'মানে বুড়ো ম্যাকঅ্যাডামকে লেসলির যে কাহিনী আপনি শুনিয়েছেন, তার কথা বলছি। শুনে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বেচারী ম্যাকের। কাহিনীটা একদম পারফেক্ট। প্রতিটি খুঁটিনাটি আশ্চর্যরকম নির্ভুল, যা একমাত্র লেসলির-ই জানার কথা। আপনার নিউ ইয়র্কের লেসলি, সে আসল না হয়েও এত কিছু কি করে জানল ভেবে কোন কিনারা পাচ্ছি না আমি। এত অবাক জীবনে কখনও হইনি আমি।'

মাটির সঙ্গে প্রায় মিশে যাওয়া লেসলি ম্যাকঅ্যাডামের কবরের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। 'কি করে বুঝব যে ওই কবরে সত্যিই কোন লাশ আছে?'

'কোন উপায় নেই। সত্যি। কিন্তু আমি জানি আছে, এবং সেটা লেসলির মৃতদেহ। আপনাকে মিথ্যে বলে আমার কোন লাভ নেই, মিস্টার রানা আপনি কি করোনারের রিপোর্ট দেখতে চান? চাইলে আমি সে ব্যবস্থা করতে পারি।'

তবু মাসুদ রানার মন মানে না। 'আপনি নিশ্চিত যে আসল লেসলিকেই কবর দিয়েছেন ওখানে?'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল পিটার হোয়াইটসাইড। 'আসল লেসলি ম্যাকঅ্যাডাম। ১৯৭৮-এর মে মাসে নিহত হয় সে।'

'স্যান্ডলার?'

'সেরকমই আমাদের ধারণা। ছুটিতে কানাডা থেকে বেড়াতে এসেছিল হতভাগী। থাকত ব্লুমসবেরির এক ফ্ল্যাটে, চারজন আর্মড গার্ড ছিল তার পাহারায়। তবু মরতে হলো মেয়েটিকে। একদিন সকালে পাওয়া গেল তার গলা কাটা লাশ।'

নিউ ইয়র্কের লেসলির কমনীয় মুখটা ভেসে উঠল রানার চোখের সামনে। ভেসে উঠল তার গলার দাগটা। অন্তত একজন, ভাবল মাসুদ রানা, অন্তত এদের একজন মিথ্যে বলছে, এদের কেউ না কেউ।

'আমাদের দৃষ্টিতে,' বলে উঠল হোয়াইটসাইড, 'বিষয়টা ভীষণরকম বিভ্রান্তিকর। এদিকে দুটো হত্যাকাণ্ড, একটা এলিজাবেথের, অন্যটা তার মেয়ে লেসলির। কোনটিরই সুরাহা করতে পারিনি আমরা আনফিনিশড বিজিনেস। হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি পাওয়ার যোগ্য নয় কোনটিই, তবে একেবারে গুরুত্ব-হীনও নয়। হেলাফেলা করার মত নয়।

'আমার ব্যক্তিগত মতামত যদি জানতে চান, তো বলি। আমার ধারণা, এলিজাবেথের মত লেসলিকেও আর্থার স্যান্ডলারই হত্যা করেছে। এবং আমার মনে হয়, এখনও বেঁচে আছে আর্থার স্যান্ডলার। কোথাও বসে কলকাঠি নাড়ছে সে। যদি জানতাম কোথায় আছে!'

জোর, ঠাণ্ডা বাতাসে শীত লেগে উঠল রানার। শিউরে উঠল ও।

'আপনার সমস্যাটা একবার ভাবুন, মিস্টার রানা। যে মানুষটি অফিশিয়ালি মৃত, দেখা যাচ্ছে সে বেঁচে আছে। আবার যে মেয়েটি বাস্তবে মৃত, সে-ও বেঁচে উঠেছে কোন অলৌকিক উপায়ে। ব্যাপারটা কতদূর টেনে নিয়ে যাবে আপনাকে, কে জানে!'

খানিক পর ফিরে চলল ওরা দু'জন। পিছন দরজা দিয়ে ঢুকে বেদী, তারপর গির্জার মেঝেতে নেমে এল একযোগে। এই সময় লোকটার ওপর চোখ পড়ল মাসুদ রানার। একটা বেঞ্চে বসে আছে সে, যেন প্রার্থনা করছে। অথচ আড়চোখে ওকেই দেখছে লোকটা। চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নিল সে। ভাল করে লোকটাকে লক্ষ করল মাসুদ রানা। দেখে মনে হয় ইউরোপীয়। আলপস অথবা টাইরল, কোনও এক জায়গার হবে। চেহারাটা মনের মধ্যে গেঁথে নিল মাসুদ রানা।

'মিস্টার রানা,' রোভারের কাছে এসে মুখ খুলল হোয়াইটসাইড। 'আপনি কি বিষয়টা নিয়ে আরও এগোতে চান?'

'অনেকদূর ইতিমধ্যেই এগিয়েছি আমি, তাই না?' বৃদ্ধের ধূর্ত চোখের দিকে তাকিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল ও।

'অল রাইট। এগিয়ে যান। আমার একটা অনুরোধ ছিল, যদি কিছু মনে না করেন।'

'বলুন।'

'আর্থার স্যান্ডলারকে এ মুহূর্তে কে বা কারা পরিচালনা করছে যদি জানতে পারেন, দয়া করে জানাবেন আমাকে। আমার সরকার কৃতজ্ঞ থাকবে আপনার প্রতি।'

সরাসরি কোন কথা দিল না মাসুদ রানা। 'যদি সক্ষম হই।'

গাড়িতে উঠে বসল ওরা। স্টার্ট দিল রজার্স হান্টার। নিঃশব্দে বেলগ্রাভিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করল রোভার।

***